সুন্দর ও অসুন্দর

এম. মতিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ

সুন্দর ও সৌন্দর্য নন্দনতত্ত্বের প্রধান উপজীব্য। শিল্প রসিকজন সুন্দর ও সৌন্দর্য নিয়ে অনেক কথাই বলে থাকেন। সুন্দর কী? কীভাবে সুন্দরকে সংজ্ঞায়িত করা যায়? সুন্দরের স্বরূপ-লক্ষণ কী? সুন্দরের তটস্থ লক্ষণ বলতেই বা কী বোঝানো হয়? অসুন্দর ও সুন্দরের বিভেদক লক্ষণ কী? ঠিক কোন মানদণ্ডের আলোকে আমরা সুন্দর বস্তুকে অসুন্দর বস্তু থেকে পৃথক করতে পারি? বস্তু বা ব্যক্তিতে এমন কী থাকলে সেই বস্তু বা ব্যক্তি সুন্দর বলে বিবেচিত হয়? আর কীসের অসদ্ভাবে ব্যক্তি বা বস্তুকে অসুন্দর বলে দাবি করা হয়? সুন্দর ও অসুন্দর ব্যক্তিসাপেক্ষ, না-কি বস্তুসাপেক্ষ? নন্দনতাত্ত্বিক মহলে এসব জিজ্ঞাসার মীমাংসা আজও সম্ভব হয়নি। যুগে যুগে বিভিন্ন শিল্পরসিক এবং নন্দনতত্ত্ববিদ নিজ নিজ সিদ্ধান্তের নিকষ-পাষাণে সুন্দর ও অসুন্দরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতে করতে সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণাটিকেই প্রহেলিকাপূর্ণ করে তুলেছেন। কিন্তু এই প্রহেলিকার জালের মধ্যে থেকে প্রকৃত সুন্দর ও অসুন্দর আবিষ্কার করাটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুরু থেকেই শিল্পরসিক ও নন্দনতত্ত্ববিদেরা সুন্দর ও অসুন্দরকে নিয়ে এক ধরনের লীলাখেলায় যেন মেতে উঠেছেন। নানা মূর্তি, নানা চিত্র, নানা ছন্দ, নানা নৃত্য ও সুরেলা ঝঙ্কারে তাঁরা সুন্দর ও অসুন্দরকে সবার সামনে ধরে এনেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বলতে গেলে সবার আগে তাদের মুখই বন্ধ হয়ে যায়। (অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৪: ৩৪)

আলোচনার সূত্রপাত

সুন্দর ও অসুন্দরকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়? নন্দনতত্ত্বের কোনো শিক্ষার্থীকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তারা নানা যুগের নানা ক্রান্তধী যাজ্ঞিকের সংজ্ঞা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারে। এতে তারা কোনো বিপাকে পড়বে না। সুন্দর ও অসুন্দর সম্পর্কে সক্রেটিস কী বলেছেন, প্লেটো কী বলেছেন, এরিস্টটল কী বলেছেন, নব্য-প্লেটোবাদী

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্লটিনাস কী বলেছেন, সেইন্ট অগাস্টিন কী বলেছেন, লঙ্গিনাস কী বলেছেন, জিয়াম্ভাতিস্তা ভিকো, আলেকজান্ডার বৌমগার্টেন কী বলেছেন, কান্ট, হেগেল, শিলার, গ্যাটে কী বলেছেন, টলস্টয় কী বলেছেন, ক্রোচে কী বলেছেন, রিচার্ডস কী বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ কী বলেছেন, আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী কী বলেছেন, সব মুখস্থ বলে দিতে পারে অবলীলাক্রমে। কিন্তু এতসব বলে দেয়া সম্ভব হলেও একটা জিনিস কেউ বলতে পারে না। তা হচ্ছে, নানা মতের কোলাহলের মধ্যেই আছে তাদের ভেতরের নিগূঢ় ঐক্য বা পার্থক্য। এই সদ্ভাব বা অসদ্ভাব হচ্ছে আসল বিষয়। এটাই কেউ বলতে পারছে না। আর এটাই হচ্ছে নন্দনতত্ত্বের মূল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানেই নিহিত রয়েছে অন্যান্য সমস্যার সমাধান। এই সমস্যার সমাধান করতে পারলে আমরা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচিত সুন্দর ও অসুন্দরের স্বরূপ সম্পর্কীয় সমস্যারও সমাধান করতে পারব অনায়াসে।

সাধারণ বা প্রচলিত ব্যবহারে বস্তুগত দিক থেকে যা নিখুঁত ও সম্পূর্ণ বলে আমাদের কাছে অনুভূত হয় তাকেই আমরা সুন্দর এবং যা তার বিপরীত তাকে অসুন্দর বলে মান্যতা দিই। কারণ একটা অখণ্ড, সামগ্রিক ও নিখুঁত অভিব্যক্তি সবসময়ই এক বিশেষ ধরনের আনন্দ দেয়। আর এই আনন্দই বস্তু বা ব্যক্তিটিকে আমাদের কাছে সুন্দর বলে প্রতিপন্ন করে। আর একটা খণ্ডিত, আংশিক ও নিখুঁত নয়, এমন অভিব্যক্তি থেকে আমরা নিরানন্দই লাভ করি। তাই এ ধরনের ব্যক্তি বা বস্তু আমাদের কাছে অসুন্দর বলেই প্রতীত হয়। (Croce, 1959: 163) সুন্দর এবং অসুন্দরের এই ব্যাখ্যা বস্তুবাদী সন্দেহ নেই। তবু দৈনন্দিন ব্যবহারে সুন্দর ও অসুন্দরকে আমরা এভাবেই প্রয়োগ করে থাকি। সুন্দর ও অসুন্দর সম্পর্কিত এ ধরনের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপে অভিব্যক্ত ব্যক্তির অনুভবকেন্দ্রিক ধারণারই সমর্থক। প্রকৃতকল্পে, সুন্দর ও অসুন্দর নিয়ে যত ব্যাখ্যা প্রচলিত তার সবগুলো মূলত এক এবং সমভাবাপন্ন। তাই সুন্দর ও অসুন্দরের এ ধরনের ব্যাখ্যাকে আমাদের দ্বারা উপলব্ধ এক ধরনের আনন্দ ও নিরানন্দ বলেই অভিহিত করা যেতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী যা আমাদের মানসলোকে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক না করে আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত করে তাকেই আমরা সুন্দর এবং এর বিপরীত অবস্থাকে অসুন্দর বলে অভিহিত করে থাকি।

সুন্দর ও অসুন্দরের এই ব্যাখ্যায় এখানে এটা মনে হতে পারে যে, নন্দনতত্ত্ব মূলত সৌন্দর্যভিত্তিক বিজ্ঞান। এ ধরনের মনে হওয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শিল্পরসিক এবং নন্দনতত্ত্ববিদেরা সর্বদাই চেষ্টা করে চলেছেন সকল শিল্প সম্পর্কে প্রযোজ্য এমন একটি সংজ্ঞা দিতে, যাতে আমরা খুব সহজেই সুন্দরের মাপকাঠিতে নির্ধারণ করতে পারি কোন বস্তুটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, আর অসুন্দরের কারণে কোন বস্তুটিকে শিল্পরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা

যাবে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এ ধরনের কোনো সংজ্ঞা আবিষ্কার করতে পারিনি। আমরা যদি শিল্পদর্শন এবং নন্দনতত্ত্বের মৌলিক গ্রন্থগুলো গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে পাঠ বা অনুশীলন করি তাহলে এ ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। পরম সুন্দরকে তার স্বরূপে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস যে একেবারে হয়নি, এমনটাও ভাবা যায় না। প্রকৃতির অনুকরণ হিসেবে, উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা রূপে, কিংবা সংহতি, ঐক্য, সামঞ্জস্য ইত্যাদির দিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশুদ্ধ ও অখণ্ড সৌন্দর্যের সে সকল ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত নন্দনতত্ত্বের ইতিবৃত্তে উপন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, এসব ব্যাখ্যা কোনো কিছুকেই উপস্থাপন করতে পারেনি। অথবা কোনো কোনো ব্যাখ্যায় সুন্দরের দু'একটা লক্ষণমাত্রকে অঙ্গীকার করা হয়েছে, সব লক্ষণ, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ পুরোপুরিভাবে তাতে প্রতিফলিত হয়নি।

প্রকৃতকল্পে সুন্দর বা অসুন্দর কোনোটাকেই বস্তুগতভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। (Mothersill, 1984: 142) সুন্দর ও অসুন্দর নিয়ে যতগুলো সংজ্ঞা প্রচলিত আছে তাদের সবগুলোকেই একটি মাত্র সংজ্ঞায় পর্যবসিত করা যায়। প্রচলিত সংজ্ঞাগুলো আসলে একই আত্মমুখী সংজ্ঞার অর্থব্যঞ্জনা বহন করে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে, সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে সুন্দর বলা যায় যা শিল্প পদবাচ্য। কোনো বস্তু যখন কোনো আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত না করে আনন্দ দান বা তৃপ্তি বিধানে সক্ষম, তখন তা-ই সুন্দর। আর কোনো বস্তু তা করতে না পারলে অসুন্দর হতে বাধ্য। কাজেই নিরাসক্তভাবে আনন্দ দান করাই শিল্প বা সৌন্দর্য উভয়েরই লক্ষ্য। অবশ্য কোনো কোনো নন্দনতত্ত্ববিদ এ ধরনের সংজ্ঞার যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন কোনো বস্তু যে আনন্দ দান করে তার কারণ কী? হাচিসন, ভলটেয়ার, ডিডেরো প্রমুখ অনেকেই সৌন্দর্যবিষয়ক আলোচনার বিষয়কে অভিরুচির প্রশ্নে রূপান্তরিত করেছেন। আর অভিরুচির সংজ্ঞার্থ নিরূপণের সকল প্রয়াসই যে পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, নন্দনতত্ত্বের ইতিবৃত্ত ঘাটলেই একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। কোনো বস্তু থেকে কেন একজন তৃপ্তি লাভ করে, এবং অন্যজন অতৃপ্তি পায় তার কোনো পূর্বনির্ধারিত বিধি-বিধান নেই। তাই অভিরুচির ধারণা দিয়ে সুন্দর ও অসুন্দরকে ব্যাখ্যা করা সময় ও মেধার অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

একারণেই জ্ঞানানুশীলনের একটি বিজ্ঞান থেকে আমরা যা প্রত্যাশা করি, প্রচলিত নন্দনতত্ত্ব তা আমাদের দিতে পারে না। তার মানে, শিল্প যেন শিল্পের লক্ষণ বা বিধি-বিধানের সংজ্ঞা দিতে পারে না, সুন্দর কী, অথবা অসুন্দর বলতেই বা কী বোঝায় তার সদুত্তর দিতে পারে না; যদি অভিরুচিকে শিল্প ও তার গুণাগুণের নির্ধারক হিসেবে মান্যতা দেয়া হয় তাহলে তারও কোনো সার্থক ব্যাখ্যা আমরা প্রচলিত নন্দনতত্ত্ব থেকে পাই না। তাছাড়া, সুন্দর-অসুন্দরের যেসব প্রচলিত সংজ্ঞা মীমাংসার আলোকে কোনো কর্মকে শিল্প

বলে স্বীকৃতি দিতে, বা কোনো কর্মকে শিল্পকর্ম হিসেবে অস্বীকৃতিও জানাতে পারছে না। এমতাবস্থায় সুন্দর ও অসুন্দরের এসব প্রচলিত সংজ্ঞার্থের ওপর আমরা নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি না। সুন্দর-অসুন্দরের এসব প্রচলিত সংজ্ঞার্থের স্বভাবলক্ষণ এরকম। প্রথমে এ ধরনের সংজ্ঞার্থে কোনো কোনো সৃষ্টিকর্মকে তৃপ্তিদায়ক বলে শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি, এবং তারপর এমন একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করা, যার আধারে এই বিশেষ গোষ্ঠীর তৃপ্তিবিধায়ক সৃষ্টিকর্মগুলোকে শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায়। সেজন্য সুন্দর ও অসুন্দরের প্রচলিত সংজ্ঞার্থের আলোকে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। এজন্য নন্দনতত্ত্ববিদেরা সুন্দর ও অসুন্দরের এসব প্রচলিত সংজ্ঞার্থের ওপর আদ্যতা না দিয়ে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থোদ্ধারে মনোনিবেশ করার সুপারিশ করেন। (Kant, 1987: 147)

সুন্দর শব্দের অর্থোদ্ধার

সুন্দর ও অসুন্দর শব্দ দুটি পরস্পর বিপরীতার্থক। একটির উপলব্ধি থেকে অন্যটিকেও অনুমান করে নেয়া যায়। সুন্দর এই হলে অসুন্দর হবে তার বিপরীত। সুন্দর সদর্থক হলে অসুন্দর হবে নঞর্থক। একারণে আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্দর শব্দটি ব্যবহার করব এবং এর বিপরীত অবস্থার মাধ্যমে অসুন্দরকে নির্দেশ করব। যাই হোক এবার আমাদের মূল আলোচনায় ফেরা যাক। বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে, সুন্দর ও অসুন্দর কোনো শব্দকেই আমরা বস্তুগত অর্থে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না। তাই আমরা প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গে শব্দ দুটির ব্যবহার ও তাদের অর্থোদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি বর্তমান অনুচ্ছেদে।

প্রাত্যহিক জীবনে সুন্দর ও অসুন্দর শব্দ দুটিকে কখনওই আমরা এক অর্থে ব্যবহার করি না। (Mothersill, 1984: 221) তাই শব্দ দুটির ব্যবহারও একবিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সুন্দর শব্দটির প্রতিই দৃষ্টি দেয়া যাক। আমরা যখন বলি সুন্দর আচরণ, সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর কাজ, সুন্দর মন, সুন্দর সুরলহরী, সুন্দর নৃত্যভঙ্গি, সুন্দর ছবি আঁকার হাত, সুন্দর রান্নার হাত, সুন্দর দেহ তখন এসব বাক্যে কিন্তু 'সুন্দর' শব্দটি ঠিক এক ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিংবা আমরা এমন দাবিও পেশ করি না যে, উল্লিখিত সবগুলো বাক্যে এক ও অভিন্ন অর্থে 'সুন্দর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। একটু অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই আমরা এখানে ব্যবহৃত 'সুন্দর' শব্দটির পারস্পরিক অসদ্ভাব উপলব্ধি করতে পারি। এ কারণে সৌন্দর্যদর্শনের বা নন্দনতত্ত্বের পাঠ গ্রহণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

সুন্দর শব্দটিকে যখন আমরা আচরণ ও ব্যবহার অর্থে প্রয়োগ করি তখন তা মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং বিচারসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তখন এটি কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাপারকে আদৌ

নির্দেশ করে না। কেউ সুন্দর ব্যবহার করল কী-না, কেউ সুন্দর আচরণের অধিকারী কী-না, তার জন্য বিচার-ব্যাখ্যা প্রয়োজন, মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। দক্ষ, কঠিন এবং সার্থকভাবে সম্পন্ন কর্মকেও আমরা প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গে সুন্দর বলে মান্যতা দিই। আবার মনের সুন্দরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যের প্রতি ব্যবহার, বা কাজ করা থেকে অনুমান করে নিই। 'আর্ত-পীড়িত'দের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করার কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। এখানেও কাজের ধরন থেকে আমরা সুন্দরের ব্যবহারটা অনুমান করে নিতে পারি। এই ব্যবহার কিন্তু পুরোটাই বুদ্ধিগ্রাহ্য। বুদ্ধির আলোকেই আমরা এসব ক্ষেত্রে 'সুন্দর'-এর প্রয়োগ বিচার করি।

তবে, সুন্দর মন বললে ব্যাপারটা একটু প্রহেলিকাপূর্ণ ও রহস্যঘন হয়ে ওঠে। কারও মন সুন্দর, না-কি অসুন্দর তা আমরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় জানতে পারি না। শতবছর ধরে কারও সঙ্গে একত্রে বসবাস করেও আমরা কারও মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারি না। কে কখন কী চায়, কীভাবে চায়, কেন চায়, কীজন্য চায়, কতটুকু চায়, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারলেও চাক্ষুষ করতে পারি না। সেক্ষেত্রে কারও মন সুন্দর কি-না, তা আমরা কীভাবে দেখব? আসলে সুন্দর মন দেখার বিষয় নয়। এখানে প্রতিবাদকারী বলতে পারেন, কারও মন সুন্দর কী-না তা জানতে হলে মনের সাহায্য নিতে হবে। মনই মনকে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যে সব গুণের সদ্ভাব থাকলে মনকে সুন্দর বলা যায় তার কয়েকটি লক্ষণ এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে। সুন্দর মনের অধিকারী ব্যক্তির প্রথম লক্ষণ সৌকুমার্য। তারপর পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি, সুশৃঙ্খলা এবং ক্ষমাশীলতা। এসব গুণের যৌথ সমাবেশ ঘটলেই সুন্দর মনের অধিকারী হওয়া যায়। এ পর্যন্ত যত মহৎ প্রাণ মহানুভব সুন্দর মনের অধিকারী ব্যক্তি এই পৃথিবী নামক গ্রহটিতে এসেছেন, তাদের সবার মধ্যেই অন্য সব মানবিক গুণের সঙ্গে এ গুণগুলোও যুগপৎভাবে কার্যকর ছিল।

অবশ্য সুন্দর-এর এ ধরনের ব্যাখ্যা আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। এ ধরনের ব্যাখ্যা আমাদের নন্দনতত্ত্বের অঙ্গরাজ্য থেকে বাইরে ঠেলে দিতে পারে। (Stace, 1989: 120) কারণ এ ধরনের ব্যাখ্যায় সুন্দর ও অসুন্দরের তাৎপর্য নন্দনতাত্ত্বিক না হয়ে নৈতিক হয়ে যাচ্ছে। 'সুন্দর' এ ধরনের ব্যাখ্যায় 'ভালো' এবং 'অসুন্দর' 'মন্দ' হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে নন্দনতত্ত্বকে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার অবকাশ দেখা দেয়। গানের গলায় যখন আমরা 'সুন্দর'-কে কিংবা নৃত্যের ভঙ্গিমায় যখন আমরা 'সুন্দর'-কে প্রয়োগ করি; তখন বলি 'তার গানের গলা খুব সুন্দর' কিংবা যখন বলি, 'তার পরিবেশিত ধ্রুপদী নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি খুব সুন্দর' তখন কিন্তু সুন্দরের এ ব্যবহারে নীতি-নৈতিকতার কোনো স্পর্শ থাকে না। গান কিংবা নৃত্যে 'সুন্দর' শব্দটি মাধুর্য, কুশলতা বা দক্ষতা

অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ অবশ্য এ ধরনের ব্যবহারে প্রতিবাদ করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন, সঙ্গীত বা নৃত্যের ক্ষেত্রে 'সুন্দর' না বলে 'মধুর' বলা উচিত। তবে সঙ্গীত ও নৃত্যে 'সুন্দর'-এর এ ব্যবহার অনুচিত হলেও একেবারে অস্বীকৃত নয়। প্রতিবাদী দার্শনিক বলতে পারেন, ভাষা ব্যবহারে ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করার কাজ নন্দনতত্ত্ববিদের নয়। তাঁর কাজ সুন্দর ও অসুন্দরের বিভিন্ন বাস্তব প্রয়োগ থেকে তার সাধারণ কিংবা বিশেষ অর্থ উদ্ধার করা। এ দিকেই নন্দনতত্ত্ববিদের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

নন্দনতত্ত্ববিদদের মতে, 'সুন্দর' ও 'অসুন্দর'-এর অর্থোদ্ধার এবং তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি পর্যাপ্ত আদ্যতা দিতে হবে। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত বা নৃত্যকলা যাইহোক, এদের কোনোকিছুকে কেন আমরা 'সুন্দর' বা 'অসুন্দর' বলে দাবি করি? এ দাবির পেছনে আদৌ কোনো যুক্তি আছে কি? না-কি এদের কোনো কোনোটিকে কেবল ভালো লাগে, বা কেবল মনোরম বা চিত্তাকর্ষক কিংবা সুখপ্রদ বলে সুন্দর, আর তার বিপরীত হলে অসুন্দর বলে বিবেচনা করি? না-কি যাদের আমরা সুন্দর বলে মান্যতা দিই, তাদের মধ্যে এমন কোনো গুণধর্ম আছে, যার জন্য ওই ধরনের ভালো লাগা, সুখপ্রদ, মনোরম বা চিত্তাকর্ষক মনোভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে? অন্যদিকে, যাদের আমরা অসুন্দর বলে বিবেচনা করি, যাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যার জন্য মন্দ লাগা, অসুখপ্রদ, অমনোরম ও নিরানন্দ মনোভাব আমাদের মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে? তবে নান্দনিক সৌন্দর্য অর্থহীন হয়ে পড়ে, নান্দনিক সৌন্দর্যও যথার্থভাবে উপভোগ্য ও অনুভূত হতে পারে না, যদি না রসিকজন বা রসিকমন থাকে। তাই সৌন্দর্যকে পুরোপুরি উপভোগের পথেও নানা ধরনের বাধা প্রহেলিকা সৃষ্টি হতে পারে। একথা কিন্তু অসুন্দরের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। রসিকমন না থাকলে অসুন্দরকেও অসুন্দর বলে উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই প্রহেলিকা একদিকে নয়, নানাদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

অবশ্য রসিকমন নিয়েও আপত্তি আছে। যিনি রসিক তিনি কিন্তু কোনো-না-কোনো সমাজেই বাস করেন। সমাজে বাস করেন বলে তার মনও সামাজিক। এ কারণে রসিকজনও পরিবর্তনশীল এক মানবিক সত্তা। দেশভেদ এবং কালভেদে রসিকজনের পরিচিতি, তার উপভোগ, তার অনুভব, তার আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই পরিবর্তন সাপেক্ষ। এ পরিস্থিতিতে যাকে আমরা রসিকজন বলে সাব্যস্ত করব তার একটি সদ্ব্যাখ্যা আমাদের দিতে হবে, শত পরিবর্তনের মধ্যেও ব্যক্তিসত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা দিতে হবে, নয়ত রসিকমনের বাইরে, বিষয়বস্তুর অন্তঃস্থ ক্ষেত্রে আমাদের সুন্দর ও অসুন্দরের সন্ধান করতে হবে। এছাড়া আমাদের তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই। বিষয়বস্তু এবং শিল্পবস্তুর বস্তুসত্তা পদার্থবিদ্যার বিচারে এবং দৃশ্যত এক এবং অভিন্ন হলেও নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে তাদের

মধ্যে কিন্তু উল্লেখযোগ্য অসদ্ভাব বিদ্যমান। আর এই অসদ্ভাব স্তরগত, বস্তুর বস্তুসত্তা বা দৃশ্যরূপের নয়। কোনো বস্তুর যে স্তরকে আমরা নান্দনিক স্তর হিসেবে দাবি করি তা যে বস্তুসত্তা বা বস্তুরূপ থেকে পৃথক তা পরিষ্কার উল্লেখের দাবি রাখে। এই স্বাতন্ত্র্য-কে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে আরও একাধিক প্রাসঙ্গিক বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা জরুরি। কাজেই রসিকমনে সুন্দরের অধিষ্ঠান বললে এই বিষয়গুলো আমাদের সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে যে রসিকমনের কথা বলা হচ্ছে তার নান্দনিক অভিজ্ঞতার সাধারণ লক্ষণ কী? দেশ ও কালভেদে রসানুভব পরিবর্তনশীল হলেও রসিকমনের নান্দনিক অভিজ্ঞতার কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। নান্দনিক অভিজ্ঞতার সাধারণ লক্ষণগুলোও তাই অপরিবর্তনীয়। এই লক্ষণগুলো জানা থাকলে নান্দনিক বিচারেও সহায়তা প্রত্যাশা করা যায়। নান্দনিক অভিজ্ঞতার এই সাধারণ লক্ষণগুলো থেকে আমরা অন্যভাবেও উপকৃত হতে পারি। এই লক্ষণগুলো জানা থাকলে ব্যক্তিগত ভালো লাগা বা মন্দ লাগার সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা এবং নৈরাজ্য থেকেও আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। কেউ কেউ আবার সৌন্দর্যকে অনির্বচনীয় বলে দাবি করেন। (Hegel, 1975: 137) সুন্দর ও অসুন্দরকে অনির্বচনীয় বলে দাবি করার মধ্যে যেমন কোনো মৌলিকতা নেই, তেমনি এ ধরনের বক্তব্যের কোনো সার্থকতাও নেই। সুন্দর ও অসুন্দরের লক্ষণ যদি অনির্বচনীয়ই হয়, তাহলে এ বিষয়ে পারস্পরিক কথোপকথন এবং মতবিনিময় করারও কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। কিন্তু তা তো এক ধরনের অসম্ভব ব্যাপার। সুন্দর কী? অসুন্দর কী? কী ধরনের শর্ত উপস্থিত থাকলে বস্তুটি সুন্দর হয়? আর কী ধরনের শর্তের অসদ্ভাবে বস্তুটি অসুন্দর বলে সাব্যস্ত হয়? এ সব প্রশ্নের সদুত্তর আমরা যে নিজেরাই কেবল বুঝি তা-ই নয়, হরহামেশা অন্যকেও আমরা বুঝিয়ে থাকি।

দর্শনের যে অঙ্গরাজ্যকে আমরা মূল্যতত্ত্ব (axiology) নামে অভিহিত করি সেই মূল্যতত্ত্বের অন্যান্য শাখা, যেমন: ন্যায়শাস্ত্র (logic) ও নীতিবিদ্যা (ethics)-এ স্বীকৃত মৌলিক ধারণাগুলো, যেমন: সত্যতা, বৈধতা, ভালো, ন্যায় প্রভৃতি বুঝতে বা অন্যকে বোঝাতে আমরা যে ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হই, স্বাভাবিক কারণে মূল্যতত্ত্বের তৃতীয় শাখা হিসেবে স্বীকৃত নন্দনতত্ত্বের ধারণাগুলোর ক্ষেত্রেও একই ধরনের অসুবিধাকে আমাদের অতিক্রম করতে হয়। নীতিশাস্ত্রের ভালো ও মন্দ, কিংবা ন্যায় ও অন্যায় প্রভৃতি ধারণাগুলোকে যেমন আমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তেমনি অন্যকেও দেখাতে পারি না। বিশ্লেষণী দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুওর (১৮৭৬-১৯৫৮)-কেও কবুল করে নিতে হয়েছিল যে, ভালোত্বের ধারণা অসংজ্ঞেয়। তাঁর মতে, ভালোত্বকে প্রাকৃতিক বা পরাতাত্ত্বিক যে ধরনের গুণের

দ্বারাই সংজ্ঞায়িত করা হোক-না-কেন, সেটি ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। তাই ভালোত্বের ধারণা, তাঁর মতে অসংজ্ঞেয়। ভালোত্বকে উপলব্ধি করে নিতে হয়। ন্যায়শাস্ত্র এবং নন্দনতত্ত্বের মৌলিক ধারণাগুলোর ক্ষেত্রেও এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। সেজন্য নন্দনতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ সরাসরি নন্দনতত্ত্বের এ ধরনের মৌলিক ধারণার মর্মমূলে পৌঁছবার চেষ্টা না করে আমাদের আলোচনা শৈলীতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এসব ক্ষেত্রে আমাদের শৈলী হওয়া উচিত সুন্দর ও অসুন্দরের আনুষঙ্গিক ধারণা ও অবস্থাদির পর্যালোচনা এবং তাদের তাৎপর্য অনুসন্ধান করা। আমরা যদি সরাসরি নন্দনতত্ত্বের সুন্দর ও অসুন্দর শীর্ষক মৌলিক ধারণার অন্তঃস্তলে প্রবেশ না করে আলোচিত ধারণাগুলোর আনুষঙ্গিক বিষয়ের পর্যালোচনা করে তাদের নিহিতার্থ অনুধাবন করতে যাই তাহলে আংশিকভাবে হলেও উদ্ভূত অনাহূত প্রহেলিকার হাত থেকে মুক্ত হতে পারি। সুন্দর কী? অসুন্দর কী? সরাসরি এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন না করে বরং আমরা এ প্রশ্ন তুলতে পারি যে, কেন কোনো বস্তুকে আমরা সুন্দর বলে মান্যতা দিই? কেনই বা কোনো জিনিসকে অসুন্দর সাব্যস্ত করে তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই? এই 'কেন' একটি বিরাট প্রশ্ন। এই 'কেন'-র বৃহৎ অঙ্গরাজ্যে দেহ, মন, সমাজ, বস্তু, রূপ, রস, শব্দ, ধ্বনি, শিল্প, ভাস্কর্য, নৃত্য, সঙ্গীত, সুন্দর, অসুন্দর, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এই 'কেন'-র প্রাথমিক উত্তরানুসন্ধানে সুন্দর ও অসুন্দরের অ-নান্দনিক ব্যবহার থেকে নান্দনিক ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বা অসদ্ভাব নির্দেশ করা সবার আগে জরুরি। (Caritt, 1962: 130)

সুন্দর-এর নান্দনিক প্রয়োগ

সুন্দর ও অসুন্দরের অনুভূতি মানুষের সহজাত। এই পৃথিবী নামক গ্রহে এমন কোনো স্বাভাবিক মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে না, যিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন না, কিংবা অসুন্দরকে এড়িয়ে চলতে চান না। তাই সুন্দর ও অসুন্দরের এক ধরনের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে স্বাভাবিক সব মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। এই অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার আলোকেই মানুষ কোনো কিছুকে সুন্দর, এবং কোনো কিছুকে অসুন্দর বলে সাব্যস্ত করে। এভাবে কোনো কিছুকে সুন্দর বা অসুন্দর বলে সাব্যস্ত করাটা মানুষের অভিজ্ঞতার প্রকাশই বহন করে চলে। অবশ্য অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত অভিজ্ঞতারও একটা অনুপম রূপ রয়েছে। এই স্বসিদ্ধ ও স্বনির্ভর রূপ ও তার লক্ষণসমূহকে আবিষ্কার ও আলোচনার আগে সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা কীভাবে মানুষের মনোলোকে দোলা দেয় তা একবার দেখে নেয়া যেতে পারে।

আমরা বলতে চেয়েছি যে, সুন্দর ও অসুন্দর উভয়ই আমাদের মনে দোলা দেয়। সুন্দর ও অসুন্দর উভয়ই আমাদের মনকে আন্দোলিত করে, মনোলোকে একটা স্থায়ী

প্রভাব বিস্তার করে। আর সেজন্যই আমরা যেভাবে সুন্দর বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই, ঠিক সেভাবেই অসুন্দর বস্তু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই। সুন্দরের প্রথম স্পর্শ যখন আমাদের দেহ-মনকে আবিষ্ট করে তখন আমাদের মনোলোকে একটি অখণ্ড অনুভূতি জাগ্রত হয়। অনুভূতির প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয় দেহকে কেন্দ্র করে, অনেকটা প্রবলভাবে। এই প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো উদ্দীপনার প্রভাবে আনন্দ-রসে সিক্ত এবং অল্পাধিক পরিমাণে নিশ্চেষ্ট থাকে। আমরা তখন সৌন্দর্যলোকে অবগাহন করি, সুন্দরকে মনে গ্রহণ করে হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করি। বলা বাহুল্য যে, দেহকে কেন্দ্র করে সুন্দরের এই অনুভূতি আমাদের হৃদয়লোককে তখন স্পর্শ করে। সৌন্দর্যের এ ধরনের অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত রূপ এবং শিল্পবস্তুর অনুভূতি তখন খুব একটা সক্রিয় থাকে না। এ যেন সুন্দরের অভিজ্ঞতার নিরাকার, নির্বিশেষ রূপ। সুন্দরের এই স্তরে বস্তুরূপও তেমন প্রবলভাবে আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না।

শিল্পরসিক ও নন্দনতত্ত্ববিদেরা সুন্দরের এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে আনন্দপ্রদ বলেই মনে করেন। (Gilson, 2000: 221) সুন্দর বস্তু থেকে লব্ধ আনন্দের এই অনুভূতি যখন দেহকে কেন্দ্র করে আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত করে তখন বিশ্লেষণ বা অনুধ্যান করলে আমরা দেখতে পাই সামঞ্জস্য, বিন্যাস, বিস্তার, তরঙ্গ, সুষমা বা এ ধরনের কিছু জটিল ধারণা জ্যামিতিক আকারে আমাদের অনুভূতিকে মনোলোকে জাগিয়ে তুলছে। এর ফলে আমাদের মনও নন্দিত হয়ে চলেছে। সুন্দর বস্তু থেকে আমরা যে আনন্দ পাই সেই আনন্দের অন্তরে নিহিত থাকে এক অদৃশ্য রূপবিভঙ্গ। তাই রূপহীন আনন্দকে সুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এই রূপবিহীন আনন্দ সুখের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যারা রূপবিহীন আনন্দকে সুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুন্দরের অনুভূতি উপভোগ করতে চান, তারা বিপদসঙ্কুল রাস্তা পরিভ্রমণকে সম্ভাষণ করে চলেন। কোনো কামোদ্দীপক ছবি বা চলচ্চিত্র দেখলে সুন্দরের অনুভূতি গৌণ হয়ে দৈহিক সুখের অনুভূতি মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রবল থেকে প্রবলতর আকার ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকৃত সুন্দরের অনুভূতির মূলে চরম কুঠারাঘাত হানা হয়। একটি রসোত্তীর্ণ শিল্পবস্তুর বিষয় কামোদ্দীপক হতে পারে। তবে একজন দক্ষ শিল্পীর পরিশীলিত রসবোধে সেই উদ্দীপনা কামের না হয়ে আনন্দেরও হতে পারে। পুরোটাই নির্ভর করছে শিল্পীরসিকের শিল্প দক্ষতার ওপর। সুন্দর বস্তুর অনুভবে নন্দনতাত্ত্বিকেরা এই বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক আদ্যতা দেয়ার সুপারিশ করেন।

একথার তাৎপর্য হল, কোনো শিল্পকর্ম মানবমনে কেমন প্রভাব বিস্তার করে, কোনো চিত্র বা সিনেমার দৃশ্য মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার বেশির ভাগটাই শিল্পী বা শিল্পদর্শকের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। কুশলী শিল্পী আপাতদৃষ্টিতে

ইন্দ্রিয়তাড়িত ছবি বা চিত্র থেকেও রসের সৃষ্টি করতে পারেন, যে রসের প্রভাবে দর্শকের মনোলোকে ইন্দ্রিয়তাড়না জাগ্রত না হয়ে সুন্দরের অনুপম ও অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে। এভাবেই কুশলী শিল্পী তাঁর শিল্প কুশলতার রূপবিভঙ্গ ও রসসঞ্চারের জন্য শিল্পবস্তুর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ইন্দ্রিয়ানুভূতি ধীরে ধীরে নির্মল সৌন্দর্যের অনুভবে উত্তীর্ণ হয়। এখানেই শিল্পীর সার্থকতা। অবশ্য এই প্রয়াস শিল্পবস্তুতে প্রথমদিকে অস্পষ্ট ও অস্ফুট থাকলেও একেবারে অনুপস্থিত থাকে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। শিল্পী তাঁর প্রতিভায় সেই অস্পষ্ট ও অস্ফুট ভাবকেই স্পষ্ট করে তোলেন। তাই সৌন্দর্যানুভবের উপাদানের সবগুলোকে নির্বিচারে রসিকমনের কল্পনাসৃষ্ট বলে মান্যতা দেয়া যায় না। এ কারণেই সৌন্দর্যবোধকে স্রেফ রূপনির্ভর বলেও অভিহিত করা যায় না। সৌন্দর্যবোধে রূপের সঙ্গে রসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই রস কেবল মানুষই আস্বাদন করতে পারে। মানবেতর প্রাণীর বেলায় রসের কোনো কার্যকারিতা নেই। তাই সৌন্দর্য যে পরিমাণে রূপাশ্রয়ী, ঠিক সেই পরিমাণে রসাশ্রয়ীও বটে। এই রূপ ও রসের যৌথ সম্মিলনেই রসিকমনে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে।

দৈহিক অনুভূতি বা শারীরিক অভিজ্ঞতা সৌন্দর্যবোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সন্দেহ নেই। কিন্তু দৈহিক অনুভূতি বা শারীরিক অভিজ্ঞতাই সৌন্দর্যবিচারে শেষকথা নয়। সৌন্দর্যবোধে দৈহিক অনুভূতির সঙ্গে রূপ ও রসের অবদান অনস্বীকার্য। এই রূপ এবং রস সম্বন্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি আমরা সচেতন হতে না পারি তাহলে সৌন্দর্যের যথার্থ অনুভূতি সম্পন্ন হতে পারে না। তবে এ ব্যাপারে প্রাথমিক স্তরে আমরা সচেতন হতে না পারলেও তার অস্বচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেহ-মন প্রথম থেকেই নিঃশব্দে বহন করে চলে। (Sartre, 1967: 38) কাজেই সুন্দর ও অসুন্দরের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতায় দৈহিক অনুভূতি, রূপ ও রসবোধ সমভাবে ক্রিয়াশীল। এখানে দৈহিক স্তর থেকে কীভাবে সৌন্দর্যবোধের উত্থান ও বিকাশ ঘটে তার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে স্মৃতি এবং কল্পনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতীতের অভিজ্ঞতাকে স্মৃতি কীভাবে সঞ্চিত রাখে এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কীভাবে তা সঞ্জীবিত করে তার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। সৌন্দর্যবোধও এখানে একটি অনন্য সাধারণ অবদান রাখে। আমাদের মধ্যে নানা ধরনের দৈহিক সংস্কার ও প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে। এগুলো এবং অভিজ্ঞতার মূল অনুষঙ্গ থেকে সুন্দর স্মরণীয় বিষয়গুলোকে মনোলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। সুন্দরের একাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। (Osborne, 1968:137)

অবশ্য এ কাজে স্মৃতি এবং কল্পনা ছাড়া বিচার-বুদ্ধিরও একটা মৌলিক অবদান স্বীকার্য। এই বিচার-বুদ্ধি এবং কল্পনার সৃষ্টিশীলতার সাহায্যে আমরা দূর অতীতকে

সাম্প্রতিক সময়ে এবং বর্তমানকে অনাগত ভবিষ্যতের মহাঙ্গনে নিয়ে যেতে পারি। ইচ্ছার আলোকে বিচার-বুদ্ধি স্মৃতির সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে আনন্দদায়ক সুন্দরকে নির্বাচন করে এবং তার যে অপূর্ণতা রয়েছে কল্পনার সাহায্যে তার পূর্ণতা দেয়ার চেষ্টা করে। আর সেজন্যেই শৈল্পিক সৌন্দর্যকে ঐতিহাসিক সত্যের নির্বিকার প্রতিবিম্ব বলে আখ্যাত করা যায় না। কারণ বস্তুর সৌন্দর্য সজ্জিত অভিজ্ঞতায় যেভাবে ভূমিকা পালন করে, ইচ্ছা, প্রত্যাশা এবং অনুভূতিও যেভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং, বস্তুর সৌন্দর্য সৃষ্টিকে একটি সরল প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা সমীচীন নয়। কিন্তু তাই বলে যা মনোরম, চিত্তাকর্ষক, সুখপ্রদ এবং ভালো লাগার বিষয় তাকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দেয়াও যায় না। কারণ তাহলে শরীরবোধের গোধূলিতে সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই নির্বিচার অনুভূতির প্রাবল্যকে দূর করতে হলে আমাদের দূরত্বের বিধিনিষেধ পালন করা একান্ত প্রয়োজন। আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার উৎসস্থল থেকে কালের মাপকাঠিতে দূরে অবস্থান করার পরও যদি সৌন্দর্যবোধ অব্যাহত থাকে তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে যে, ইচ্ছা, প্রত্যাশা ও অনুভূতি ছাড়াও আরও কিছু আছে যা সৌন্দর্যবোধের ভিত্তিমূলে কাজ করে। মানবদেহ একটি আশ্চর্য ও রহস্যঘন সত্তা এই দেহ সৌন্দর্যস্মৃতির সার্থক আশ্রয় হলেও তার সঞ্জীবনমন্ত্র রয়েছে বিচার-বুদ্ধির অধিকারে। কল্পনাই তার সৃজনশীল মায়াবী কৌশলে বিচারবুদ্ধির হাতে এই সঞ্জীবন-মন্ত্র তুলে দিয়েছে।

কাজেই ইচ্ছা, অনুভূতি এবং প্রত্যাশার সম্মিলিত প্রভাব ছাড়াও বস্তুর সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টিতে বিচার-বুদ্ধির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুন্দর ও অসুন্দর শিরোনামে উপস্থাপিত আমাদের বর্তমান আলোচনায় একটি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া খুবই প্রয়োজন। আর সেই প্রশ্নটি হল আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় যে সুন্দরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি তা কীসের ওপর প্রযোজ্য? আমরা কি আমাদের বর্তমান আলোচনায় কোনো বস্তু বা বিষয়ের সুন্দরের কথা বলতে চাইছি? না-কি সেই বস্তু বা বিষয়ের যে ছাপ বা প্রভাব আমাদের মনোলোকে পতিত হয় তার কথা বলতে চাইছি? সত্য কথায় বর্তমান আলোচনায় আমরা যে সুন্দর ও অসুন্দরের কথা বলছি তা সরাসরি বস্তু বা বিষয়ের সৌন্দর্য, না-কি বস্তু বা বিষয়ের ছাপ বা প্রভাবের সৌন্দর্য এখানে আমাদের বিচার্য বিষয়? এ দুটি কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। একটি বস্তু বা বিষয়ের ওপর, আর অন্যটি ওই বস্তু বা বিষয়ের ছাপ বা প্রভাবের ওপর প্রযোজ্য। আমরা এখানে কোনটির ওপর প্রযোজ্য সুন্দর ও অসুন্দর নিয়ে আলোচনা করছি? অনুধ্যানের সূত্রপাত হিসেবে এখানে আমরা শারীরিক বা দৈহিক অভিজ্ঞতা, সুখ বা আনন্দের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে বস্তুরূপের বা বিষয়রূপের সুন্দর, অসুন্দর হিসেবেই আমাদের আলোচনার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। (Panofsky, 1968: 56) বস্তুরূপের ওপরেই আমরা সুন্দর ও অসুন্দরকে প্রয়োগ করে সৌন্দর্যের স্বরূপোলব্ধির চেষ্টা করছি।

আমরা যদি দৈহিক বা শারীরিক অভিজ্ঞতার লক্ষণগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করি তাহলে বিষয়ী বা মানসজগতের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যেভাবে সুখানুভূতির অন্তর্লীন ভাবরূপের সুস্পষ্ট পরিচয় লক্ষ করি, ঠিক তেমনি আবার সুন্দর বস্তু বা বিষয়ের বস্তুরূপ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের অবদানও আমরা লক্ষ করি। বস্তু বা বিষয় যেমন অনুভবকে উদ্দীপ্ত করতে পারে তেমনি ভাব এবং অনুভবকেও বস্তু বা বিষয় উদ্দীপ্ত করার যোগ্যতা রাখে। বস্তু বা বিষয়েই সুন্দর ও অসুন্দর অধিষ্ঠান করে। তাই বস্তু বা বিষয়কে বাদ দিয়ে সুন্দর বা অসুন্দর কোনোটার কথাই আমরা চিন্তা করতে পারি না। বস্তুই সুন্দর বা অসুন্দর হয়। তাই বস্তু বা বিষয়ের ওপরই আমরা সুন্দর ও অসুন্দর প্রয়োগ করি। এ কারণে নন্দনতত্ত্ববিদেরা যখনই সুন্দর ও অসুন্দরের কথা বলেন তখন বস্তু বা বিষয়কে কেন্দ্র করেই সৌন্দর্যবিচারে অগ্রসর হন। যে অনুভূতি বস্তু বা বিষয়দীপ্ত তা অধিকতর দেহ বা শরীরনির্ভর। এখানেই সৌন্দর্যবিচারে দৈহিক বা শারীরিক কাঠামোটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তবে যে অনুভবের কারণমূলে কোনো-না-কোনো ভাব ক্রিয়াশীল থাকে, তার সুখ-দুঃখের দিকটা শূন্যগর্ভ হলেও তুলনায় নেহায়েৎ লঘু। ভাব কিংবা বস্তু যেদিক থেকেই আমরা শুরু করি না কেন, নিরবচ্ছিন্ন সুন্দর ও অসুন্দরের ভাবনা-চিন্তা বস্তু বা বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

অবশ্য একজন যথার্থ সৌন্দর্যসন্ধানী নন্দনতত্ত্ববিদ এই বস্তুগত বা বিষয়গত সীমান্ত সম্পর্কে আদৌ উৎসাহী নন। নন্দনতত্ত্ববিদ ধ্যান করেন বস্তু বা বিষয়ের সুন্দর ও অসুন্দর নিয়ে। সেই বস্তু বা বিষয় সীমান্তবর্তী, না-কি প্রান্তিক এ নিয়ে তিনি ভাবিত নন। আবার প্রত্যক্ষবাদের ঘোর সমর্থকেরা সুখ ও দুঃখ নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় বেশি আগ্রহী। সুন্দর বলতে প্রত্যক্ষবাদীরা বোঝেন সুখপ্রদ বিষয়ের প্রত্যক্ষ, আর অসুন্দর বলতে বোঝেন দুঃখপ্রদ বিষয়ের প্রত্যক্ষ। বস্তু বা বিষয়কে তারা অনন্ত, সীমাহীন ভাবপুঞ্জ হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাদের কাছে বস্তু বা বিষয়ের আর কোনো পরিচয় নেই। প্রত্যক্ষবাদীরা এই যে সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন এই সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে একদিকে রয়েছে দৈহিক বা শারীরিক বৃত্তির নিগূঢ় সম্পর্ক, অন্যদিকে মনসিক স্মৃতির সঙ্গেও এই সুখ-দুঃখ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে সম্যক অর্থে উপলব্ধি করতে হলে এই উভয়দিকের প্রতিই পর্যাপ্ত আদ্যতা দিতে হবে। এখানে একটির গুরুত্ব বাড়াতে গিয়ে অন্যটির গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। সৌন্দর্য বিচারের দীর্ঘ অনুশাসনে প্রকৃতি ও সংস্কার অপরিবর্তিত থাকলে এক ধরনের নির্দিষ্ট ভাব, এক ধরনের নির্দিষ্ট প্রকৃতি ও সংস্কারকেই জাগ্রত করবে এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতিও পূর্ব-নির্ধারিত পথে বিকশিত বা সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। (Parker, 1976: 59)

অনুভব কখনও বিচারবিযুক্ত হতে পারে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিচারহীন অনুভব সম্ভব হলেও তা নিতান্তই সাময়িক। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিচারবুদ্ধির সাহায্য ছাড়া অনুভব হতে পারে, কিন্তু কালক্রমে তা বিচার-বিবেচনার আওতায় চলে আসে। সংস্কার ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু এগুলো তখনও সুন্দরের অনন্ত বৈচিত্র্যকে পূর্বনির্ধারিত গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। আবার স্মৃতি কখনও তার নিজের স্বাতন্ত্র্যে স্থির থাকতে পারে না। কল্পনা সর্বদাই কখনও সম্পূর্ণ সচেতনভাবে, আবার কখনও নিঃশব্দে স্মৃতিকে অবিরামভাবে পরিবর্তন করে চলেছে। এদিকে সৌন্দর্য চেতনায় দেহ বা শরীরের ভূমিকাকেও খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তবে এ ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তা না হলে একটা ভুল ধারণার আশঙ্কা থেকে যায়। যাকে আমরা বস্তুবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান বলি, এরাও সহজেই বস্তুরূপ নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যদর্শন বা নন্দনতত্ত্বে তা বেশ কঠিন। বৈজ্ঞানিক বস্তু ও সামাজিক বস্তুর তুলনায় সুন্দর বস্তু অবশ্যই মূর্ত এবং যে কারণে তা সহজেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি জাগাতে পারে। কিন্তু সেই অনুভূতির বৈচিত্র্য এত প্রবল যে প্রত্যক্ষবাদীর শরীরাশ্রয়ী সুখ-দুঃখের বিশ্লেষণে তার সম্যক পরিচয় লাভ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই সুন্দর ও অসুন্দরের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি লাভের জন্য বস্তুরূপ ও শিল্পরূপ নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে সৌন্দর্যলোকের শরীর স্পর্শে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

বস্তুরূপ ও শিল্পরূপ

শিল্প রসিকজন এবং নন্দনতত্ত্ববিদেরা বস্তুরূপ এবং শিল্পরূপের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অসদ্ভাব রয়েছে বলে স্বীকার করেন, যদিও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উভয়ের এই পারস্পরিক অসদ্ভাব অন্তর্লীন হয়ে যায়। তারপরও আপাতদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যকার এই অসদ্ভাব বেশ স্পষ্ট বলেই নন্দনতত্ত্ববিদেরা মনে করেন। তারা মনে করেন যে, একটি বস্তুকে আমরা বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে অবলোকন করতে পারি এবং করেও থাকি। তাই বস্তুর বস্তুরূপ কখনও স্থির ও অনড় হয়ে থাকতে পারে না। স্থানভেদে এবং কালভেদেও বস্তুর বস্তুরূপ বিভিন্ন ও বিচিত্র আকার ধারণ করে। এসব বিচিত্র ও বিভিন্ন আকারের সমবায়েই বস্তুর বস্তুরূপ গঠিত হয়। কিন্তু বস্তুর শিল্পরূপের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।

বস্তুর শিল্পরূপের নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড রয়েছে। কোন ধরনের কর্মটিকে আমরা শিল্পকর্ম হিসেবে মান্যতা দেব তার পূর্বনির্ধারিত বিধি-বিধান রয়েছে এবং শিল্পতাত্ত্বিক মহলে সবাই এসব বিধি-বিধান সম্পর্কে কমবেশি সচেতনও আছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, যা আমাদের রসাপ্লুত করে, রসসিক্ত করে তা-ই শিল্প। এই 'রস' শিল্পের একটি অপরিহার্য বৈশেষিক বা বিভেদক লক্ষণ। আর এই বৈশেষিক লক্ষণটিকেই শিল্পরসিক এবং

নন্দনতত্ত্ববিদেরা বস্তুর শিল্পরূপ বলে অভিহিত করেন। বস্তুর বস্তুরূপে আমরা যে বৈচিত্র্য, যে ভিন্নতা, যে অসদ্ভাব লক্ষ করি সেই বিচিত্ররূপেই বস্তু আমাদের দৃষ্টিতে 'সুন্দর' রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এ কারণে বস্তুর বস্তুরূপের বৈচিত্র্য, ভিন্নতা ও অসদ্ভাবের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। আবার বস্তুর বস্তুরূপের এই বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা আমাদের ভিন্ন পথেও চালিত করতে পারে। বস্তুরূপের যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তার অনুধ্যান, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করলে এটাও আমরা লক্ষ করতে পারি যে, বস্তুর যে বস্তুরূপকে আমরা বিশুদ্ধ বলে দাবি করি তা আসলে কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। এর মধ্যে ভাবরূপ, কল্পনার বিন্যাস, আবিষ্কার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি অবদান মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে পারস্পরিক ও তথাকথিত অসদ্ভাব বা সূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে শিল্পরূপের পরিণতি লাভ করে। (Sesonke, 1965: 201)

এ প্রসঙ্গে তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, কীসের কারণে বস্তুর বস্তুরূপ শিল্পরূপে, সুন্দররূপে পর্যবসিত হয়? প্রশ্নটি আমরা অন্যভাবেও উত্থাপন করতে পারি। আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কেন, কীভাবে, কীসের জন্যে দেহাশ্রয়ী সুখ-দুঃখের অনুভূতি সংস্কার, প্রবৃত্তি এবং স্মৃতির সীমিত পরিধি অতিক্রম করে বৈচিত্র্যের পথে বিকশিত হতে পারে? আমাদের এই দেহে যা সুখ ও দুঃখরূপে অনুভূত হয় তার কারণ কিন্তু পুরোটাই শারীরিক বা দৈহিক হতে পারে না। দেহ বা শরীরকে আধার বা অধিকরণ বলা গেলেও সুখ-দুঃখের অনুভূতির হেতু বা কারণ বলে দাবি করা যায় না। একটা সীমিত অর্থে অংশত শরীরকে সৌন্দর্যানুভতির কারণ বলা যেতে পারে। মানবেতর প্রাণীর শরীরে সুখ ও দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে সৌন্দর্যানুভূতির কোনো সম্পর্ক স্বীকৃত নয়। আংশিকভাবে যে কারণে শারীরিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা অভিজ্ঞতার পর্যায়ে সৌন্দর্যের আস্বাদ লাভ করি তার মূল বৈশিষ্ট্য কিন্তু অর্থবহতা, তাৎপর্যময়তা এবং ব্যঞ্জনা। সৌন্দর্যবিচারে এ বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তা না হলে বস্তুর সৌন্দর্যবিচার প্রহেলিকার চোরাবালিতে পতিত হয়ে দিশেহারা হতে বাধ্য। (Croce, 1959: 139)

এখানে যে অভিজ্ঞতার স্তরে সৌন্দর্যের আস্বাদ লাভের বৈশিষ্ট্যের কথা, অর্থবহতা, তাৎপর্যময়তা ও ব্যঞ্জনার কথা বলা হল, এই পদগুলোও সবসময় এক এবং অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এ পদগুলো স্বরূপতই অনেকার্থক। বাঙলা ভাষায় এ ধরনের আরও কিছু শব্দ রয়েছে। যেমন: অভিধা, সঙ্কেত, ইঙ্গিত ইত্যাদি শব্দ। এগুলোও অনেকার্থক। এত গেল শব্দ বা পদের ভেদ। অর্থের মধ্যেও ভেদ রয়েছে। ভাব্য ও ভাবনীয়, যার অর্থ ভেবে বুঝতে হয় তাকে বলে ভাব্য, এবং যা শুনলেই বোঝা যায় তাকে বলে ভাবনীয়। এ ধরনের শব্দের একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যকে আত্ম-

অতিক্রামক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এ ধরনের শব্দের মধ্যে শ্রাব্য বা দৃশ্য রূপের অতিক্রান্ত কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাংলাভাষী যেকোনো লোক 'বর্ষা' শব্দের অর্থ বোঝে। 'বর্ষা' শব্দের দ্বারা ঠিক কী বোঝানো হয়, তা বাংলাভাষী কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। 'বর্ষা' যে একটি অর্থপূর্ণ শব্দ, বাংলাভাষী মাত্রেই তা জানে এবং বোঝে। তবে 'বর্ষা' শব্দটি তার নিজের শক্তিতেই অর্থপূর্ণ বলে স্বীকৃত হয় না। এ স্বীকৃতির জন্য তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিচিতির ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

কারও কারও ধারণা বাংলা ভাষায় আমরা যে ধ্বনি শব্দটি প্রয়োগ করি তার অর্থ অন্তর্নিহিত এবং সামাজিক রীতি-পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। সেক্ষেত্রে ধ্বনি স্রেফ ধ্বনি, কর্মে শব্দতরঙ্গ সংযোগ নয়, তা থেকে আরও অতিরিক্ত কিছু নির্দেশ করে। এই অতিরিক্ত কিছু ধ্বনির অন্তর্নিহিত গুণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ভাষা প্রয়োগকারীর কাছে প্রতিভাত হয়। অবশ্য অর্থ ব্যঞ্জনা সঠিকভাবে ধ্বনির অন্তর্নিহিত গুণ বা সম্পত্তি কি-না, এ ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। ভাষা ও সমাজনিরপেক্ষভাবে ধ্বনির অর্থ বোঝা বা বোঝাতে পারলে সংশয়ের অবকাশ থাকত না। দুদিক থেকে ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা যায়: সমাজাশ্রিত ও চেতনাশ্রিত। (Parker, 1976: 34) সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ রেখে যেমন ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়। এছাড়া, ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ককে একদিক থেকে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বলেও অভিহিত করা যায়। প্রকৃতকল্পে ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক নির্ণয়সাপেক্ষ। একে পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক হিসেবে মান্যতা দেয়া যায় না। কাজেই ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ককে আমাদের এ আলোকেই বিচার করতে হবে।

ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার রীতি ও বিধিবিধান পুরোটাই সামাজিক। যখন আমরা বলি, 'শব্দ ও বাক্যের অর্থ সমাজাশ্রিত' তখন এর দ্বারা ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে বলা হয় না। সমাজচেতনায়ও শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার রয়েছে। কেউ কেউ আবার এমন কথাও বলতে চান যে, সমাজ কেবল চেতনার ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু এ বক্তব্য আমরা সমর্থন করি না। কারণ এখানে যে চেতনার কথা বলা হচ্ছে তার পুরোটাই সামাজিক, পুরোটাই মানবচেতন। মানবেতর প্রাণির চেতনপ্রক্রিয়াকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আর যে চেতনা মানবিক, যে চেতনা সামাজিক তাই সৌন্দর্যের আধার, বাহক এবং স্রষ্টা। এই সৌন্দর্য নির্ণীত হয় সমাজের সঙ্কেত, সঙ্কেত সঙ্কলন রীতি, আচার, ব্যবহার, অভ্যাস, প্রয়োগশৈলী প্রভৃতির দ্বারা। কাজেই ব্যক্তি বা বস্তুর সুন্দর ও অসুন্দর বিচারে এগুলো উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে এবং তা অনেকটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে। এখানে আমরা 'বেশিরভাগ' বলছি, কিন্তু 'সম্পূর্ণ' বলছি না। কারণ আমরা মনে করি, সুন্দর ও অসুন্দর চেতনার বহির্ভূত। যদিও চেতনার এই দুই অংশের

মধ্যে আমরা কোনো স্থায়ী সীমারেখা টানি না, তবু আচারে ও বিচারে এই সীমারেখা খুবই স্পষ্ট। সৌন্দর্যচেতনার সমাজাশ্রিত দিকটিকে উপেক্ষা করলে দুটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। প্রথম প্রশ্ন : আমাদের সমাজ ও ভাষাবহির্ভূত অন্যদের সঙ্গীত-সাহিত্যের রসভোগে কেন আমরা বিফল হই? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন : তাদের শিল্পরস আস্বাদনের প্রক্রিয়াই কেন অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ?

নান্দনিক সৌন্দর্যবিচারে রূপান্তরের প্রসঙ্গটিও এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় অর্থগত কারণে কোনো কোনো ধ্বনি তার প্রাসঙ্গিক পদে, কোনো কোনো শব্দ তার প্রাসঙ্গিক সুরে, কোনো কোনো অঙ্গভঙ্গি বা দেহসঞ্চালন প্রাসঙ্গিক নৃত্যলীলায়, এবং কোনো কোনো বর্ণবিন্যাস তার প্রাসঙ্গিক চিত্রে রূপান্তরিত হয়। মানবমনের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল, সে অর্থের বিস্তার ও গভীরতাকে কোনো একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুরোপুরিভাবে পরিমাপ ও পরিগ্রহণ করতে পারে না। অর্থের প্রাথমিক প্রজন্মকে অবলোকন করলে মনকে তা আকৃষ্ট করে এবং মন তাতে সাড়াও দেয়। এভাবে ধারাবাহিক ভাবনাচিন্তার ফলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট ভাষা, সুর, নৃত্য, চিত্রের তাৎপর্য মনোলোকে উন্মোচিত হতে থাকে। (Aldrich, 1963: 36) এই উন্মোচন প্রক্রিয়া কিন্তু সময় এবং ভাবনাসাপেক্ষ। তাৎপর্যেরও একাধিক ক্ষেত্র রয়েছে। অর্থকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুসরণ ও ভাবনাচিন্তা করার ফলে তাৎপর্য সশরীরে মনোলোকে উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ পায়। তবে তাৎপর্যের অনুসরণ অনেকাংশেই ঘনিষ্ঠ পরিচিতি এবং সঙ্কেত সঙ্কলন রীতির ওপর নির্ভরশীল। যেমন সঙ্কেত প্রধান নাটক, চিত্রশিল্প কিংবা ধ্রুপদী নৃত্যের অঙ্গলীলা সহজে অনুধাবন করা কঠিন। সঙ্কেতেও আবৃত্ত তাৎপর্যের উপলব্ধি এবং পরে উপভোগের জন্য পর্যাপ্ত বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে। তবেই সৌন্দর্যবিচার সুসম্পন্ন হতে পারে।

এবার আমরা সৌন্দর্য প্রকাশে সহায়ক এমন এক গুণ বা ধর্মের কথা বলব, যা তাৎপর্যে পূর্বনির্ধারিত কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থিতে বা ক্রমান্বয়ে আবদ্ধ নয়। নন্দনতত্ত্ববিদেরা এই গুণধর্মের নাম দিয়েছেন ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনার অর্থ খুবই সীমিত। ব্যঞ্জনা হচ্ছে অর্থের অস্পষ্ট অথচ অনুভাবনীয় ব্যাপ্তি। অর্থের প্রাঞ্জলতা কিংবা তাৎপর্যের নির্দিষ্ট সীমায় ব্যঞ্জনাকে আবদ্ধ করে দেখা যায় না। ব্যঞ্জনা তার স্বরূপ ও স্বভাবগত কারণেই সার্বিকধর্মী। কোনো বিশেষ বা বিশিষ্ট ভাবপ্রক্রিয়ায় ব্যঞ্জনাকে সীমিত করা চলে না। অর্থকে আশ্রয় করে বিশেষ রীতি-শৈলীর আধারে ব্যঞ্জনা বিকশিত হয়, বিস্তৃত হয়। ব্যঞ্জনা কেবল সঙ্গীতশিল্প, চিত্রশিল্প বা নৃত্যশিল্পেই অধিষ্ঠান করে না। শিল্পকলার প্রায় সকল অঙ্গরাজ্যেই ব্যঞ্জনা অল্পাধিক পরিমাণে কার্যকর থাকে। ব্যঞ্জনা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সৌন্দর্যের অনুভব ও উপভোগকে সহজ ও অবমুক্ত করার

কাজে। ব্যঞ্জনাকে অবমুক্তির একটি রূপ বলেও নন্দনতত্ত্ববিদেরা মান্যতা দেন। নৃত্যলীলায় প্রদর্শিত বিষয়ের পটভূমি, সাজসজ্জার ব্যবহার, উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতা, অঙ্গভঙ্গির সঞ্চালন, মুদ্রার সামঞ্জস্য এবং দৈহিক ক্ষিপ্রতা ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পকর্মের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বিষয়ের যে ব্যবধান তার মধ্যেই স্থিত থাকে ব্যঞ্জনার ভিত্তিভূমি। ব্যঞ্জনায় একদিকে শিল্পের বিষয়বস্তু এবং অন্যদিকে রসিকচিত্তের অনুভূতি নির্ভরশীল। এ পর্যায়ে আমরা সুন্দর ও অসুন্দর নির্ণয়ে রূপবিচার ও রসবিচারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

রূপবিচার ও রসবিচার

বাংলা ভাষায় 'সুন্দর' অর্থেই 'রূপ' শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাই যখন কেউ বলেন 'মেয়েটি রূপবতী' তখন এর দ্বারা তিনি এটাই বোঝাতে চান যে, 'মেয়েটি সুন্দরী'। অবশ্য 'রূপ' শব্দের একটি মূল্যায়ন নিরপেক্ষ অর্থও রয়েছে। রূপ শব্দের সঙ্গে 'সু' অথবা 'কু' যুক্ত করে অতি সহজভাবেই আমরা রূপ শব্দটিকে মূল্যায়নসূচক শব্দে রূপান্তরিত করে নিতে পারি। এই রূপ শব্দটি কখনও আকার বা আকৃতি, আবার কখনও প্রকার বা জাতি অর্থেও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ার ঐতিহ্য আছে। যা দেখা যায় বা দেখা যায় না, এমন সব বস্তুই রূপবিশিষ্ট। ইংরেজি 'form' হচ্ছে রূপের নিকটতম প্রতিশব্দ। রূপ কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কখনও বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং কখনও স্বজ্ঞেয় হতে পারে। তবে শিল্পের সৌন্দর্য বিচারে, সুন্দর ও অসুন্দর নির্ণয়ে রূপ শব্দটি এই তিন অর্থেই প্রযুক্ত হতে পারে। রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকটি শিল্পবস্তুর বিষয়সত্তার প্রকাশক হিসেবে কাজ করে। এটা রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকের প্রধান কাজ। (Chipp, 1968: 169) গৌণত রূপের এই দিকটি অর্থ, তাৎপর্য এবং ব্যঞ্জনাকে অস্ফুটভাবে প্রকাশ করে। সুন্দর ও অসুন্দর নির্ণয়ে রূপের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংক্ষেপে বলা যায়, সৌন্দর্য বিচারে রূপবিচার কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়, অপরিহার্যও বটে।

বস্তুত রূপ শব্দটির বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং স্বজ্ঞা–এই তিনটি দিক একই সঙ্গে অনেক সময় আমাদের মনোলোকে উপস্থিত হয়। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং স্বজ্ঞা বস্তুর বস্তুরূপ এবং শিল্পরূপকে কেবল একই সঙ্গে যে অধিকার করে তা-ই নয়, ঐক্যবদ্ধভাবে উপস্থাপনও করে সৌন্দর্যবিচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বস্তুর প্রকৃত রূপ জানার জন্য আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধানত বুদ্ধির ওপর নির্ভর করি। আর বস্তুর সুন্দর ও অসুন্দর উপলব্ধি করার জন্য বুদ্ধির তুলনায় ইন্দ্রিয় এবং স্বজ্ঞার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করি। ইন্দ্রিয়ের আলো অস্পষ্ট। সেজন্য ইন্দ্রিয়ের অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ আলোতে রূপ পরিপূর্ণভাবে

আত্মপ্রকাশ লাভ করতে পারে না। মানুষের ইন্দ্রিয় রূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণভাবে রূপকে উন্মোচন করতে অপারগ। বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞা রূপের সম্পূর্ণ পরিমাপ সম্বন্ধে সচেতন হলেও রূপ কীভাবে রসের অধিকরণ হয়, রূপ কীভাবে রস সৃষ্টি করতে পারে তা তাদের নিজেদের শক্তিতে ধরতে পারে না। গণিত, জ্যামিতি আর ন্যায়শাস্ত্র হলো শুদ্ধ বুদ্ধির আদর্শ। অবশ্য সঙ্গীতে গণিত সুপ্ত এবং চিত্রে জ্যামিতি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। কিন্তু তারপরও সঙ্গীত ও চিত্রের মাধুর্য ও সৌন্দর্য উপভোগে গণিত ও জ্যামিতির তুলনায় ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইন্দ্রিয়পথেই সৌন্দর্য প্রথম আমাদের কাছে ধরা দেয় এবং তাতে শরীরের অবদান অপরিসীম। সৌন্দর্যবোধের অকৃত্রিম স্পর্শে যখন শরীর আন্দোলিত হয়, সৌন্দর্যবোধের পরশে শরীরে যখন স্পন্দন জাগে তখনই বুদ্ধির প্রদীপশিখায় রূপ ও রস আমাদের মনোলোককে আপ্লুত করে, প্রভাবিত করে। তবে সুন্দরের অভিজ্ঞতায় মন যে নন্দিত, আনন্দিত হয় তাতে শারীরিক দিকটি প্রবল হলেও অন্তর্লীন বৌদ্ধিক ও স্বাজ্ঞিক দিক দুটিও কম গুরুত্ব বহন করে না। কোন রূপের সঙ্গে কোন রসের সম্মিলনে সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভব হয় তাতে বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার ভূমিকা অনস্বীকার্য। অবশ্য এ স্তরেই রূপ রসের অধিকরণ হয় না। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, মানবেতর জীবেও কিন্তু রূপবোধের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সেই রূপ নিছকই আকারগত। বিশেষ বিশেষ আকার দেখে মানবেতর জীবেরও সুখবোধ হতে পারে। কিন্তু মানবেতর জীবের বেলায় সৌন্দর্যবোধ প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ মানবেতর জীব সুখভোগের অধিকারী হতে পারলেও সৌন্দর্যভোগের অধিকারী হতে পারে না। সৌন্দর্যভোগের একচ্ছত্র অধিকার কেবল মানুষেরই আয়ত্তাধীন। মানবেতর প্রাণির সৌন্দর্যভোগ নেই কেন? এর উত্তরে বলা যায়, রূপ ও রসকে ধারণ করার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, মানবেতর জীবের সেই বুদ্ধিবৃত্তি নেই। কাজেই মানবেতর প্রাণীর রূপবিচার এবং রসবিচারও সম্ভব নয়। মানুষই কেবল রূপবিচার ও রসবিচার করতে পারে, যেহেতু মানুষ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয় বৃত্তিরই অধিকারী।

শিল্পরসিক এবং নন্দনতত্ত্ববিদদের মতে, সুন্দরের সৃষ্টি এবং উপভোগে রূপ যে ভূমিকা পালন করে তার কোনো তুলনা হয় না। বলা যায়, এ কাজে সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং উপভোগের কাজে রূপ এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। রূপ হিসেবে যাকে আমরা শুদ্ধ রূপ হিসেবে মান্যতা দিই তা প্রকৃত অর্থেই বিশুদ্ধ। এ বিশুদ্ধ রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নয়, এ হচ্ছে বস্তুর অন্তঃস্থ রূপ, নিগূঢ় আকার। তাই রূপ মানেই অমূর্ত। এই রূপেরই সমন্বয়, সামঞ্জস্য এবং সংগ্রহগ্রন্থি সৌন্দর্যবোধের ভিত্তিমূলে কাজ করে। রূপ সৌন্দর্যের ভিত্তি, তবে কারণ বা হেতু নয়। আবার কোনো বস্তুতে রূপের সামঞ্জস্য

ঘটলেই যে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হয়ে যাবে, নন্দনতত্ত্বের কোনো শিক্ষার্থীই এমনটি প্রত্যাশা করেন না। রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা বস্তুতেই অধিষ্ঠান করে। এই পৃথিবী নামক বস্তুজাগতিক গ্রহে রূপ ও বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকে। এদের একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করে অনুভব করা যায় না। রূপ ছাড়া যেমন বিষয় হতে পারে না, তেমনি বিষয় ছাড়া রূপের অধিষ্ঠানও অসম্ভব। শিল্পজগতে সৌন্দর্য সৃষ্টির তাগিদে শিল্পী রসিকসুজন তাঁর প্রতিভায় রূপ এবং বিষয়ের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। তাই শিল্পজগৎকে বস্তুজগতের প্রতিভাস বা প্রপঞ্চ বলে অভিহিত করা যায় না। কাজেই শিল্পী কর্তৃক রূপ ও বিষয়ের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং স্বগত। (Dickie, 1971: 144)

মানবদেহের উদাহরণ প্রয়োগ করে রূপ ও বিষয়ের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। মাইকেল এঞ্জেলোর ম্যাডোনা এবং ডেভিড চিত্রে মানবদেহে আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক চিত্র সৌন্দর্য ধারণ করে চলেছে। গভীর অভিনিবেশ নিয়ে এই চিত্রগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে চিত্রগুলোর অন্তর্নিহিত অস্থিসংস্থান, পেশীসংস্থান, গ্রন্থি প্রভৃতি জীববিজ্ঞানের সকল বিধি-বিধান ও নির্দিষ্ট রূপ অনুসরণ করে অঙ্কিত হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। এর ইচ্ছাকৃত একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, আর তাহলো ডেভিডের করতল দুটি। তবে এই করতল দুটি অঙ্কন করে চিত্রটিকে জীবন্ত করা হয়েছে। তাই করতল সৃষ্টি খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। কেবল এটাই শেষ কথা নয়। এর অতিরিক্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রূপ ও বিষয়ের সম্পর্ককে জীববিজ্ঞানের কৌলীন্য রক্ষা করে সৌন্দর্যের পরমসত্তায় উন্নীত করা হয়েছে। এই চিত্রে সামঞ্জস্য, সমন্বয়, সংগ্রহগ্রন্থি ও সমপ্রসন্ধি প্রভৃতি গুণগুলোও রূপ এবং বিষয়কে একাত্ম করে সুন্দর ও সানন্দ করে তোলা হয়েছে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়ের উপাদানগুলোকে সামঞ্জস্যে বেঁধে, বিচিত্রভাবে তাদের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে, নানাভাবে বিভিন্ন উপাদানকে একই শিল্পকর্মে প্রয়োগ করে এবং তাদের গ্রন্থনের প্রকার ও চরিত্রে নানা ধরনের বিন্যাস এনে, সকল উপাদানকে একটি অখণ্ড শিল্পকর্মে অন্তর্ভুক্ত করে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এর কোনো তুলনা হয় না। এই তুলনারহিত প্রক্রিয়ায়ই একজন যথার্থ শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে যথার্থ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলেন। এ ধরনের শিল্পের শিল্পরসেই আমরা রসাপ্লুত হই। (Bosanquet, 1957: 151)

এদিকে শিল্পকলার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও পারস্পরিক অসদ্ভাব সুস্পষ্ট, এবং এই অসদ্ভাবের কারণে সৌন্দর্যবিচারের প্রক্রিয়াও একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সাহিত্যকর্ম, বিশেষত নাটক বা উপন্যাসে শিল্পের উপাদান, স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী, ঘটনা, কাহিনি প্রভৃতিকে যেভাবে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয় সঙ্গীত, চিত্র বা নৃত্যে তা সেভাবে

করা হয় না। এতে আমরা যে কেবল শিল্পকর্মের বৈচিত্র্যের প্রকাশ লক্ষ করি তা-ই নয়, এতে বিভিন্ন উপাদানের বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক ধর্ম এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও আমরা স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারি। এতে আমরা আরও একটা বিষয় লক্ষ করি। কোনো কোনো শিল্পকর্মে রূপের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও তার সার্বভৌমত্ব এবং বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। আমরা লক্ষ করি রূপ ও বিষয়ের সামঞ্জস্যের ধারণার মধ্যে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য খুবই উহ্য থাকে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অবশ্য ভিন্ন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি রাগের আবেশে প্রাসঙ্গিক কিছু বাণীবদ্ধ থাকে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাণীরূপ এবং রাগরূপের মধ্যেও একটি সংযোগ রক্ষা করা হয়। সঙ্গীতে বাণীরূপ তার অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, আর রাগরূপকে প্রকাশ করা হয় তাল, লয় ও মূর্ছনার মাধ্যমে। ঋতু, সময় বা প্রহর, শিল্পীর মন, আমেজ রসাপ্লুত পরিবেশ-পরিস্থিতি সঙ্গীতের মাধুর্যকে বিকশিত করতে প্রাণপণ সাহায্য করে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও চিত্রের নানা উপাদান একটি অন্তর্নিগূঢ় ভাবকে প্রকাশ করার জন্য ছোট-বড় নানা বিষয়ের, নানা বর্ণবিভাবের পশ্চাদভূমির সাহায্য নেয়া হয়। সবকিছু মিলে শেষবিচারে একটা কিছু হয়ে ওঠে। সব কয়টি রূপ, সব কটি বিষয়, তাদের ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত সত্ত্বেও একটা সামগ্রিক ও সর্বাত্মকরূপে সন্ধিবদ্ধ হয়ে ওঠে। শিল্পকর্মের সৌন্দর্য বিচারে এই সমগ্রসন্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে একাধিক স্বতন্ত্র বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ, এবং অবতারণা হলেও উল্লিখিত বিষয়গুলো যা হয়ত স্বতন্ত্রভাবে অত্যন্ত মনোরম ও আকর্ষণীয়, কিন্তু সর্বাত্মক অখণ্ড রূপে সন্ধিবদ্ধ হয়ে ওঠে না। আর এর ফলে একটি মূলভাব, অনুভাব এবং পরিণতিতে সার্থক ও সংহত হয়ে উঠতে পারে না। এই সমগ্রসন্ধিকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় এবং আরও মনোরম করার পেছনে আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্পকর্মে শিল্পী যে বিষয়গুলোকে উপস্থাপিত ও পরিবেশিত করেন সেই বিষয়গুলোর মধ্যে একটা শৈল্পিক ভারসাম্য থাকা একান্তভাবে জরুরি, অন্যথায় শৈল্পিক সুষমা, শিল্পের অন্তঃস্থ সৌন্দর্য ব্যাহত হতে বাধ্য। একথা কেবল বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক প্রসঙ্গে নয়, বিষয়ের সঙ্গে ভাষা, ধ্বনি, সুর ও বর্ণের সম্পর্ক প্রসঙ্গেও সমানভাবে প্রযোজ্য। গুরুবিষয়ের সঙ্গে লঘুবিষয়ের, হাসির সঙ্গে কান্নার ভারসাম্যকে একই শিল্পকর্মের পরিধির মধ্যে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন।

তবে কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। পরস্পর বিরোধী ধর্মের শৈল্পিক পরিবেশন কেবল যে সম্ভব তা-ই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ভাব বা অনুভব সৃষ্টির সহায়ক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত ভূমিকা পালন করে। পারস্পরিক

বিপরীতমুখী সুর, ধ্বনি, রেখা, বর্ণ প্রভৃতি শৈল্পিক প্রকাশ-উপাদানগুলোকে আমরা একাধিকভাবে সমগ্রসন্ধিতে সংগ্রথিত করতে পারি। স্তরভেদ, স্তরভঙ্গ, তরঙ্গ, বিবর্তন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা শিল্পের বিষয়কে মনোরম, স্বচ্ছ, সুন্দর ও মধুর করে তুলতে পারি। আর এভাবেই শিল্পে রসের উৎপত্তি ঘটে। এখানে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা হলো, যাদের সম্মিলনে শিল্পরসের সৃষ্টি হয়, তাদের সবই কিন্তু বৈচিত্র্যধর্ম প্রকাশে অনুষঙ্গ বা প্রতিষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণাকে সুস্পষ্ট করার কাজে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর অবদান সর্বাধিক। আর এ কারণে এগুলোর স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। যে সাধারণ গুণের কারণে আমরা সমগ্রসন্ধিকে সুন্দর বলে মান্যতা দিই তা হলো ঐক্যানুগ বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটে দু'ভাবে। **এক.** সমরূপ ও রসের অন্বয়ে এবং **দুই.** বিষমরূপ ও রসের অন্বয়ে। যাদের বা যে মানসিক অবস্থা সুখ, সন্তোষ এবং সার্থকতা হিসেবে পরিচিত তাদের বা তার মধ্যেও অন্বয় থাকা স্বাভাবিক। একে বলে সমধর্মী অন্বয়। এ ধরনের অন্বয়ে বৈচিত্র্য তীব্র, প্রখর এবং উজ্জ্বল হয় না, তবে প্রশান্ত, নম্র এবং স্নিগ্ধ হয়। আর বিষমধর্মী অন্বয়ে বৈচিত্র্য উদ্বোধিত হয় দ্রুত, তীব্র, প্রখর, উজ্জ্বল ও প্রবল আভায়। সৌন্দর্যবিচারে এই দু'ধরনের অন্বয় প্রক্রিয়ার ভূমিকাও অসাধারণ। (Gombrich, 1971: 139)

এখানে যে বৈচিত্র্যের কথা বলা হলো তাকে সৃষ্টি করারও কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে, যেগুলো যথাযথভাবে পালন করলেই বৈচিত্র্য আনয়ন সম্ভব। এর জন্য প্রথমেই স্রষ্টার মনে এক ধরনের পরিকল্পনা থাকতে হবে। বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা বা নকশা প্রণয়ন খুবই অর্থবহ। শিল্পীমনে এই পরিকল্পনা বা নকশা যে প্রথম থেকেই স্থায়ীভাবে বর্তমান থাকে, এমনটিও ভাবা যায় না। সমগ্রসন্ধির সন্ধানে বা তার আগ্রহাকাঙ্ক্ষায় এই পরিকল্পনা বা নকশা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বিকশিত হতে থাকে। এমন অনেক শিল্পী আছেন যারা তাদের আত্মকথনে স্বীকার করেছেন যে, তারা তাদের শিল্পকর্মের প্রারম্ভকালে সেই শিল্পকর্মের সমস্ত রূপটি, সমগ্র পরিণতিটি সুস্পষ্ট ও সজীবভাবে তাদের মনশ্চক্ষে দেখতে পান না। তবে এখানে একথা কবুল করে নেয়া ভালো যে, কতকগুলো সম বা বিষম ছককে ঘিরে স্রষ্টার শিল্প-আকৃতি স্তরে স্তরে পরিণতি ও তাৎপর্যকে সন্ধান করতে থাকে। সমগ্রসন্ধির মধ্যে বিচিত্র বিষয় থাকা সত্ত্বেও মূল-নকশা বা পরিকল্পনার বিকাশ কখনও ব্যাহত হয় না। বরং তাতে বৈচিত্র্য নব কলেবরে উন্মোচিত হয়, নতুন আকৃতি নিয়ে অভিষিক্ত হয়। এর ফলেই শিল্পকর্ম আমাদের কাছে মনোরম, আকর্ষণীয় ও সুন্দর রূপে বিবেচিত হয়। এর অসদ্ভাব থাকলে তা অসুন্দর বলে গণ্য হয়। এবার সৌন্দর্য বিচারে অভিরুচি ও ঐতিহ্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অভিরুচি ও ঐতিহ্য

রূপবিচার এবং রসবিচার নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এই রূপই হচ্ছে রসের আশ্রয় বা অধিকরণ। আর রসকে বলা যায় রূপের প্রাণ। রূপ জ্যামিতিক হয়েও জ্যামিতি থেকে যেন আরও বেশি কিছু। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রূপের ব্যবহার এত বেশি নমনীয়, বঙ্কিম, ভাঙাচোরায় নির্বাচনীয় যে, স্রষ্টার কল্পনাও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তবে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কল্পনার প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হলেও পুরোপুরি ব্যর্থ এমনটা ভাবা যায় না। নন্দনতাত্ত্বিকদের মতে, রূপের সঙ্গে রসের যখন মিলন ঘটে তখনই ঘটে সৌন্দর্যের আবির্ভাব। রূপ ও রসের এই যে মিলনের কথা বলা হলো তার যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ সরাসরি নির্ভর করে অভিরুচির ওপর। নব্য-প্লেটোবাদী কারও কারও মতে, অভিরুচি মানুষের সহজাত বৃত্তি। এ বৃত্তি মূলত দেশ ও কালোত্তীর্ণ। ব্যক্তিমানস, সমাজ এবং সামাজিক ঐতিহ্যের ওপর অভিরুচি বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। (Chambers, 1962: 40)

অভিরুচির উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে কীভাবে? এর উত্তরে নন্দনতত্ত্ববিদেরা পাঁচটি স্তর এবং বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। **এক.** প্রত্যক্ষ অভিরুচির উৎস। প্রত্যক্ষ থেকেই অভিরুচি উৎপত্তি লাভ করে। প্রত্যক্ষই মনকে বস্তুজগতের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। আর এ কারণেই প্রত্যক্ষ অভিরুচির উৎসভূমি হিসেবে কাজ করে। **দুই.** অভিরুচি প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল হয়েও বস্তুজগতের একটা বিশেষ দিকের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করে। এই বিশেষ দিকটি কারও কাছে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', আবার কারও কাছে 'মনোরম রূপসামঞ্জস্য' হিসেবে অভিষিক্ত। নন্দনতত্ত্বে যারা অভিরুচির প্রাধান্য ও কর্তৃত্বে বিশ্বাসী, জ্ঞানতাত্ত্বিক দিকে তাদের কেউ বুদ্ধিবাদী, কেউ বা অভিজ্ঞতাবাদী এবং কেউ বা বিচারবাদী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা অভিজ্ঞতাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই অভিরুচির স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করছি। প্রত্যক্ষের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে অভিজ্ঞতাবাদীরা সৌন্দর্যের প্রথম পরশ শরীর বা দেহের ওপরও পরোক্ষভাবে গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। অবশ্য 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' কিংবা 'মনোরম রূপসামঞ্জস্য' মুখ্যত প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে মান্যতা পেলেও এর সঙ্গে অন্য দুটি দিকও জড়িয়ে আছে। ১. শারীরিক সুখানুভূতি এবং ২. মানসিক বিচার। এখানে যে শরীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল মানবিক শরীরের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত। আর দ্বিতীয় দিকে মানসিক বিচারের কথা বলা হয়েছে। অভিরুচি বা সৌন্দর্যে যেকোনো ব্যাপারেই বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার ছাড়া ঐক্য বা সামঞ্জস্যের নান্দনিক রূপটি প্রকাশিত হতে পারে না। কাজেই কেবল অভিরুচিই নয়, সৌন্দর্যসহ নন্দনতাত্ত্বিক যেকোনো সমস্যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিচার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই নন্দনতত্ত্ববিদেরা বিচারের ওপর সর্বাধিক আদ্যতা প্রদানের পক্ষপাতী।

তিন. অভিরুচিবাদের সমর্থকেরা অভিরুচিকেই একটি স্বতন্ত্র বা আংশিক মানসিক বৃত্তির স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁরা মনে করেন অভিরুচি মূলত শিল্পবস্তুর প্রতি মনোচেতনার বিশেষ এক ধরনের প্রক্ষেপণ মাত্র। জ্ঞান অর্জন এর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। শিল্পবস্তুর প্রতি মনোযোগ প্রদানই এর একমাত্র কাজ। **চার.** অভিরুচির এ প্রক্ষেপণই আমাদের মানসভূমিতে সুখ, আনন্দ এবং সন্তোষবোধ জাগ্রত করে। **পাঁচ.** মনোলোকের এই বোধকে ঘিরেই সবশেষে বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়। উদাহরণস্বরূপ তখন আমরা বলে ওঠি 'আকাশের নীলিমা কত সুন্দর।' অথবা এটাও বলতে পারি যে, 'স্বর্গের অপ্সরী মেনকার নৃত্যলীলা কী সুন্দর।' তবে অভিরুচির বিচারকে হালকাভাবে নিলে চলবে না। অভিরুচির বিচার তুলনামূলকভাবে একটু জটিল। কারণ অভিরুচির বিচারে ভাষারূপ থেকে আমাদের বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ধার করতে হয়। আর এটা বেশ কঠিন কাজ। 'আকাশের নীলিমা কতো সুন্দর!' বিষয়টি এবং 'স্বর্গের অপ্সরী মেনকার নৃত্যলীলা কী সুন্দর!' এ দুটি বাক্যে ব্যবহৃত 'সুন্দর' শব্দটি বহির্জাগতিক কিংবা বস্তু-উদ্দীপক শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার কোনো বিশ্লেষণকে ব্যক্ত করে না। এ দুটি বাক্যে 'সুন্দর' পদটি আনন্দ, সুখ, সন্তোষ বা তৃপ্তিবোধের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুজগৎ অভিরুচির প্রাঙ্গণে বিচারপ্রক্রিয়ায় শিল্পজগতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত 'সুন্দর'-এ বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির চেতনা বিচিত্র দ্বন্দ্বে সমাসন্ন।

তবে সব ধরনের সুখানুভূতিকে অভিরুচির দান বলেও মান্যতা দেয়া যায় না। এমনকি শিল্প বস্তুর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সুখও অনেক সময় অভিরুচির সীমানার বহির্ভূত হতে পারে এবং অনেক সময় হয়েও থাকে। (Wolheim, 1968: 168) একটি অনাবৃত সুন্দর নারীদেহ কারও দৃষ্টিতে নিছক অনাবৃত যৌনতৃপ্তির উৎস রূপে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে অভিরুচি সক্রিয় ও সক্ষম হতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন খানিকটা মানসিক প্রশান্তি, স্থৈর্য, মনের একটি অনুত্তেজিত এবং সুস্থির ভাব। কোনো কারণে বিরুদ্ধ বা সম্পর্কবিহীন কিছু বদ্ধমূল ধারণা বা কামভাব অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত বা বিকৃত করলে অভিরুচির বিচারের কোনো মূল্য ও সার্থকতা থাকে না। এখানেই নন্দনতত্ত্ববিদেরা প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে অভিরুচি কি প্রকৃত অর্থেই একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি বা ক্ষমতা? অভিরুচির বিচার্য-বিষয়কে অনন্য বলে দাবি করা হয়, কিন্তু সাধারণ নয়। বলা হয়ে থাকে একটি পুরো শ্রেণি, এমনকি একটি শ্রেণির অনেকগুলো বস্তুও অভিরুচির বিচার্য বিষয় হিসেবে মান্যতা পেতে পারে না। এ ধরনের বক্তব্য আমরা জার্মান ভাববাদী দার্শনিক কান্ট-এর মুখ থেকে শুনতে পেরেছি। এখানে যেটা সমস্যা হিসেবে আমাদের পীড়িত করে তা হলো, যাঁরা এ ধরনের বক্তব্য রাখেন, তাঁরা একই সঙ্গে আবার দাবি করেন যে, অভিরুচির বিচার অনন্য হলেও এ বিচার সর্বজনীন।

এ ধরনের বক্তব্য স্পষ্টত সাংঘর্ষিক। যাঁরা অভিরুচিকে সাধারণ নয়, অনন্য বলে দাবি করেন, তাঁরাই আবার অভিরুচিকে দেশকাল নিরপেক্ষভাবে সবার পক্ষে উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করার মধ্যে আমরা কোনো সুযুক্তি খুঁজে পাই না। অভিরুচির বিচার যদি অনন্যই হয়, তাহলে একই সঙ্গে অভিরুচির বিচারকে সর্বজনীন বলে দাবি করা সাংঘর্ষিকতারই নামান্তর। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, অভিরুচি মূলত বিচারধর্মী, কিন্তু সৃষ্টিধর্মী নয়। সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন প্রতিভা, সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন প্রেরণা। অভিরুচি দেখে লক্ষ্যসিদ্ধির চেষ্টায় প্রতিভা যাতে অসংলগ্ন এবং অপ্রয়োজনীয় ভাবনা ও কামনাদির সঙ্গে জড়িত হয়ে না পড়ে। এটা দেখাই অভিরুচির অন্যতম কাজ। অভিরুচি যেমন শৃঙ্খলা বিধানের কাজ করে, তেমনি স্বাতন্ত্র্যও নির্দেশ করে। কল্পনা, বুদ্ধি এবং প্রেরণা শিল্পকর্মে কেমন ভূমিকা পালন করে তার মূল্যায়নের জন্যও অভিরুচির বিচার একান্তভাবে অপেক্ষিত। সংজ্ঞার্থের আলোকে অভিরুচির বিচার চলে না। সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং উপভোগে অভিরুচি যত বড় ভূমিকাই নিক-না-কেন, এর ভূমিকা কখনও দেশ-কাল নিরপেক্ষ এবং সর্বজনীন হতে পারে না। লোকভেদে অভিরুচির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে একটি বিশেষ দেশে, একটি বিশেষ কালে এক বিশেষ ধরনের বেশভূষা, অঙ্গসজ্জা, সাহিত্যশৈলী, নাট্যশৈলী, নৃত্যশৈলী, স্থাপত্য বা চিত্রশিল্প কখনও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আবার কখনও জনপ্রিয়তাও হারায়। এর পেছনে কিন্তু অভিরুচি দায়ী নয়। নন্দনতত্ত্ববিদেরা অভিরুচিকে ব্যক্তিক বলে মনে করেন। তবে ব্যক্তিমানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব, সমাজেই যেহেতু ব্যক্তিমানুষের বসবাস ও ভাববিনিময় চলে, সেকারণে অভিরুচি সামাজিক প্রভাবমুক্ত নয়। সামাজিক প্রভাব অনিবার্যভাবেই অভিরুচির ওপর পড়ে। কিন্তু তারপরও অভিরুচিকে সামাজিক বলে মান্যতা দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য কখনও কখনও অভিরুচির ওপর সামাজিক পরিবেশ-প্রতিবেশ তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ অবস্থায় অভিরুচি সার্বভৌম থাকে। (Tatarkiewcz, 1974: 179) অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিত্ববোধের সঙ্গেও অভিরুচির তেমন কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। এ কারণেই কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য–একই ব্যক্তির বিভিন্ন পর্যায়ে অভিরুচির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কৈশোর বা যৌবনে মানুষ সাধারণত রোমান্টিক শিল্পকর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকে। আবার একই ব্যক্তি যখন প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখন তার মধ্যে এ অনুরাগ আর তেমন থাকে না। কৈশোর ও যৌবনে ব্যক্তি মানুষ সতেজ ও সবল মন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে। মনের এই সজীব অবস্থা তার অভিরুচির ওপর ছাপ ফেলে। আবার একই ব্যক্তি যখন প্রৌঢ় এবং বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন মনে সেই সজীবতা থাকে না। তাই এ অবস্থায় তার অভিরুচিতেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

তবে জীবনের প্রারম্ভে, কৈশোর ও যৌবনে অভিরুচি যতটা পরিবর্তিত হয়, পরিণত জীবনে সেই অভিরুচি ঠিক ততটা পরিবর্তিত হয় না। পরিণত জীবনের অভিরুচি অনেকটাই রক্ষণশীল এবং মোটামুটি সুস্থির। জীবনের প্রথমদিকে মানুষের মন থাকে বহির্মুখী, কল্পনাপ্রবণ, প্রত্যাশী ও সৃষ্টিশীল। এরপর ধীরে ধীরে মন পরিণত হতে থাকে অন্তর্মুখী ও বিচারশীল এবং স্মৃতিনির্ভর। অবশ্যই এগুলো সবই সাধারণ। আর তাই এসবের ব্যতিক্রম যে হয় না তা কিন্তু নয়। ব্যক্তিত্ব কাঠামোর অভিরুচি গভীরভাবে গ্রন্থিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। নব্য-প্লেটোবাদীরা অবশ্য অভিরুচি নামে কোনো স্বতন্ত্র বৃত্তিকে স্বীকার করেন না। কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য আমরা সমর্থন করতে পারি না। অভিরুচিকে রসিকমনের একটি স্থায়ী নান্দনিক মনোভাব বলেই আমরা মনে করি। অভিরুচির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও তুলনা নিয়ে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। অভিরুচি যেমন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবও তেমনি আত্মনিষ্ঠ বা বিষয়ীমুখী। মূলত সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে অভিরুচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের রয়েছে এক ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও মৈত্রী। একথা প্রায় সকল নন্দনতত্ত্ববিদই স্বীকার করেন। প্রকৃতকল্পে, অভিরুচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব–এ তিনটি কমবেশি স্থায়ী এবং আত্মনিষ্ঠ বা বিষয়ীমুখী। তবে, অভিরুচিতে আত্মনিষ্ঠার প্রাবল্য বেশি। কারণ অভিরুচি প্রথমত এবং প্রধানত বিষয়বস্তুর মানসিক সুখ-দুঃখানুভূতির প্রক্ষেপণের বিচার করে। তবে এই বিচার কর্মটা পরিচালিত হয় অন্তর্মুখী প্রক্রিয়ায়।

অন্যদিকে, অভিরুচির তুলনায় দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব স্বরূপতই বহির্মুখী। যে-কোনো মানসিক ঘটনার যেমন একটি বস্তুনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা থাকে, তেমনি তাতে বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষার উপস্থিতিও লক্ষণীয়। তবে অভিরুচির ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ক্ষেত্রে তা অপেক্ষাকৃত প্রবল। অভিরুচিতে যে আকাঙ্ক্ষা থাকে তা অত্যন্ত ক্ষীণ, অপ্রতুল এবং অনেকটা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা সজীব ও শক্তিশালী থাকে। মনোভাবের বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়বস্তুর স্বরূপকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করা এবং নিজের স্থির প্রবণতায় তাকে রূপান্তরিত করা। আবার, দৃষ্টিভঙ্গির প্রবণতা মনোভাবের প্রবণতার তুলনায় অতিশয় অস্থির। তাই সে আবরণী শক্তি দিয়ে বিষয়বস্তুকে শিল্প-সুন্দররূপে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা তার খুবই কম। তাছাড়া দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবে অভিরুচি কোনো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে না। ভুলে হোক, আর অন্য কোনো কারণে হোক, অভিরুচি স্বতন্ত্র বৃত্তির মান্যতা পেয়ে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব এ স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। মনোভাব সর্বত্রই বিষয়ের প্রতি ধাবিত থাকে। তবে মনোভাবে বিষয়ের কোনো বিচার নেই। মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিরালম্ব নয়। তাদের মধ্যে সমাজ ও ঐতিহ্যের প্রভাব সরাসরি কার্যকর থাকে। এ পর্যায়ে অসুন্দরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অসুন্দরের ব্যাপ্তিরেখা

সুন্দরের তাৎপর্য ও স্বরূপধর্ম নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। এবার অসুন্দরের স্বরূপধর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক। অসুন্দরের আলোচনায় প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে অসুন্দর কি সুন্দরের আভাস মাত্র? অসুন্দরেই কি সুন্দর অধিষ্ঠান করে? অসুন্দরের আলাদা কোনো সত্তা আছে কি? যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা সুন্দরকে বুঝি বা অন্যকে বোঝাই তার কমবেশি অসদ্ভাব দিয়েই কি অসুন্দরকেও আমরা নিজেরা বুঝি এবং অন্যকে বোঝাতে পারি? সুন্দরের বিপরীত গুণধর্মই কি অসুন্দরকে বোধগম্য করার জন্য পর্যাপ্ত? না-কি অসুন্দরকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের অন্য কোনো গুণের সাহায্য নিতে হয়? কী কী শর্ত বা বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে একটা জিনিস অসুন্দর বলে প্রতীত হয়? অসুন্দর শব্দের দ্বারা আদৌ কি কোনো জিনিসের গুণধর্মকে নির্দেশ করা হয়? দৈনন্দিন ব্যবহারে যাকে আমরা কুৎসিত বা বিশ্রী বলে মনে করি তাই-কি অসুন্দরের সমার্থক? শিল্পে অসুন্দরের কোনো স্থান আছে কি? নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় প্রশ্নগুলো খুবই মৌলিক। তাই এদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে একান্তভাবে অপেক্ষিত।

আসলে আমরা যখন কোনো কিছুকে অসুন্দর বলে সাব্যস্ত করি তখন এই সাব্যস্তের মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা কোনো বোধ বা প্রতীতিকে নির্দেশ করে থাকি। এটা যেমন কোনো গুণধর্মের অভাববোধ হতে পারে, তেমনি অন্য কোনো কিছুও হতে পারে। এটা যদি ভাববাচক হয় তাহলে অসুন্দরকেও সত্তাবান ও শক্তিমান কিছুর মান্যতা দিতে হয়। অসুন্দর কোনো গুণধর্মের, অবশ্যই নেতিবাচক গুণধর্মের হলে তার সন্ধান লাভ করতে আমাদের তেমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। এক্ষেত্রে যেসব গুণধর্মের সদ্ভাবে কোনো কিছু সুন্দর বলে আমাদের কাছে প্রতীত হয়, সেসব গুণধর্মের অভাববোধকে আমরা চিহ্নিত করে আমরা অসুন্দরের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করতে পারি। সুন্দরের আলোচনায় আমরা শরীর বা ইন্দ্রিয়কে সুখাশ্রিত বলে মান্যতা দিয়েছি। আমরা দেখেছি শরীর শক্ত ও সুস্থ না হলে সুন্দরকে তার স্বরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এক্ষেত্রে আমরা রূপ ও রসের অন্বয়হীনতা ও অসামঞ্জস্যতাকে অসুন্দরের হেতু বা কারণ বলে দাবি করতে পারি। এছাড়া তাৎপর্য এবং বৈচিত্র্যের অসদ্ভাবও কখনও কখনও অসুন্দরের অন্যতম হেতু রূপে কাজ করতে পারে। তাই আবারও প্রশ্ন ওঠে, যেসব গুণধর্ম উল্লেখ করে আমরা সৌন্দর্যকে সংজ্ঞায়িত করি সেই সব গুণধর্মের অসদ্ভাবের তারতম্যই কি অসুন্দরের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে? সুন্দরের ইতিবাচক গুণধর্মের অসদ্ভাব বা অভাববোধই কি অসুন্দরের সূচনা করে? এসব গুণধর্মের অভাববোধই কি অসুন্দরকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে পর্যাপ্ত? প্রকৃতকল্পে, সুন্দর ও অসুন্দর কি একই বস্তুর ব্যাপ্তিরেখার স্বতন্ত্র দুটি দিক মাত্র? সেই ব্যাপ্তিরেখার এক প্রান্তকে গণিতসংখ্যা ১ (এক) এবং অন্য

প্রান্তকে গণিতসংখ্যা ০ (শূন্য) দিয়ে কি নির্দেশ করা যায়? এ ধরনের নির্দেশনায় অসুন্দরকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কি?

তবে সুন্দরের স্তরভেদ ও বৈচিত্র্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। (Sircello, 1975: 165) কোনো শিল্পবস্তুকে যে আমরা পর্যাপ্ত সুন্দর, কোনো বস্তুকে যে আমরা বেশি সুন্দর এবং কোনো শিল্পবস্তুকে যে আমরা কম সুন্দর বলে মনে করে সুন্দরের স্তরভেদের মধ্যে একটা সীমারেখা অঙ্কন করি, তা অস্বীকার করা যায় না। অসুন্দরের বেলায়ও একথা, এ আরোপণ সমভাবে প্রযোজ্য। অসুন্দরেও স্তরভেদ বিদ্যমান। অবশ্য সুন্দরের স্তরভেদের ব্যাপারটি অনেকে স্বীকার করতে চান না। তারা মনে করেন যে, সুন্দরের কোনো স্তরই নেই। তাই সুন্দরের ওপর স্তরভেদ প্রযোজ্য নয়। এরা অসুন্দরের স্তরভেদকে অকপটে স্বীকার করেন। কিন্তু সুন্দর তাদের কাছে স্তরহীন এবং অভিন্ন। সুন্দরের মতো সত্যেরও কোনো স্তরভেদ নেই। স্তরভেদ আছে মিথ্যার। এ ধরনের কথা আমরা ব্রহ্মবাদী বা ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এবং ক্রোচে প্রমুখের বহু রচনায় পেয়েছি। (Hegel, 1975: 169; Croce, 1959: 175) প্রকৃতকল্পে এদের সত্য ও সুন্দর সম্পর্কিত ভাব-ভাবনা তাঁদের অদ্বৈতবাদ প্রসূত। কিন্তু অদ্বৈতবাদের খোলস ছেটে ফেললে আমরা অসুন্দরের মতো সুন্দরের মধ্যেও স্তরভেদ লক্ষ করি। যদি সুন্দরের মধ্যে স্তরভেদ না-ই থাকত তাহলে আমরা একটি অন্যটির চেয়ে বেশি সুন্দর, বা একটি অন্যটির চেয়ে কম সুন্দর এমন দাবি করতে পারতাম না। অসুন্দরের মতো সুন্দরেও স্তরভেদ আছে, একথা অস্বীকার করা অযৌক্তিকতারই নামান্তর বলে মনে হয়।

যদি সুন্দর ও অসুন্দরের এই পার্থক্য বা অসদ্ভাবকে আমরা অসম্ভব বলে মনে করি তাহলে এ দুটি ধারণাকে একই ব্যাপ্তিরেখায়ও আমরা স্থাপন করতে পারি না। এক্ষেত্রে অসুন্দরকে কুৎসিতের সমার্থক হিসেবে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। অসুন্দরের তীব্রতর, প্রবলতর রূপটিকে, তার রসভাবটিকে কুৎসিত বলে মান্যতা দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না। তবে সুন্দরের বিপরীত অবস্থাকে আমরা কুৎসিত বা অসুন্দর যা বলতে মনস্থির করি না কেন, মূলত তা সুন্দরের সঙ্গে একই পরিবারভুক্ত কি-না, তা সংশ্লিষ্ট শব্দটি কোন অর্থে এবং কোন্ প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়েছে তা না-জেনে বলা যায় না। (Sircello, 1975: 111) অর্থ এবং পরিপ্রেক্ষিত বোঝারও নানা ধরনের পদ্ধতি আমাদের কাছে আছে। অভিধান ব্যবহার করে, বা ভাষা প্রযোগে আমরা অর্থ ও পরিপ্রেক্ষিত উপলব্ধি করতে পারি। আবার প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থান, কিংবা নন্দনতত্ত্ববিদের বক্তব্য আহরণ করেও আমরা এ কাজে সফল হতে পারি। আবার পরিপ্রেক্ষিত ও অর্থবোধের ব্যুৎপত্তি ও বিকাশধারা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করেও সুন্দর ও অসুন্দরের সীমার ব্যাপ্তিরেখা উপলব্ধি করতে পারি। এছাড়া, সুন্দর ও

অসুন্দরের প্রচলিত ব্যবহারও এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার করে খুব সহজেই আমরা বুঝে নিতে পারি যে, অসুন্দর সুন্দরের অঙ্গরাজ্যের সীমানায় স্থান পাবে কি-না।

অসুন্দর সুন্দরের বিরোধী, না-কি সম্পূরক, এ নিয়েও নন্দনতাত্ত্বিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে। অসুন্দর যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুন্দরের বিরোধী হয়েও থাকে, তারপরও কি এরা উভয়ে পরস্পরের ক্ষেত্রে সম্পূরক বা সহায়ক হতে পারে না? কেউ কেউ মনে করেন, অসুন্দর সুন্দরের বিরোধী হয়েও পারস্পরিকভাবে উভয়েই উভয়ের সম্পূরক বা সহায়ক হতে কোনো বাধা নেই এবং ক্ষেত্র বিশেষে এরা পারস্পরিকভাবে সহায়ক হয়েও থাকে। রূপ ও রসের যে বিভাবকে আমরা 'বিষম' বলি, সেই বিষমরূপ এবং বিষমরস উভয়ে কোনো-না-কোনোভাবে সৌন্দর্যের সমগ্রসন্ধিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অন্বয়বদ্ধ হতে পারে এবং হয়ে থাকেও। অন্বয় ও সামঞ্জস্যবোধের এই বোধ বা প্রতীতিকে স্রেফ বস্তুর স্বরূপ, জ্যামিতি, বর্ণবিভাব এবং ধ্বনিসমগ্র থেকে উপলব্ধি করা যায় না। কোনো বিষয়বস্তুকে শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত বা পর্যবসিত হতে হলে তার জন্য সহায়ক প্রেক্ষাপট, সহৃদয় ও সুবিবেচক সামাজিক পরিবেশ, অনুকূল ঐতিহ্য প্রভৃতিকেও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হয়। যেমন: সঠিক ও প্রাসঙ্গিক মঞ্চসজ্জা, আবহসঙ্গীত এবং সমধর্মবিবর্ধক বিষয়াবলি শিল্পকর্মের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পীর লক্ষ্য থাকে যাতে দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক তাঁর শিল্পকর্মকে উপলব্ধি করুক। দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক যদি কোনো শিল্পকর্মের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না-পারে তাহলে সেই শিল্পকর্ম অনাস্বাদিত থেকে যায়।

আর যে শিল্পকর্ম দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক দ্বারা আস্বাদিত হতে পারে না সেই শিল্পকর্ম অসার্থক হতে বাধ্য। তবে কোনো শিল্পকর্মই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতার দাবিও করতে পারে না। কোনো বিশেষ শিল্পকর্ম কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির কাছে যেমন বেশি আদৃত হতে পারে, তেমনি অন্য কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির কাছে ওই বিশেষ শিল্পকর্মটি অল্প পরিমাণে আদৃত হতে পারে। আবার দেশ ও কালভেদেও আদৃতের মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। কোনো বিশেষ স্থান এবং কোনো বিশেষ কালে যে শিল্পকর্মটি বেশি আদৃত থাকে, অন্য কোনো বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালে ওই একই শিল্পকর্ম কম সমাদৃত হতে পারে। শিল্পবস্তুর উপভোগের এই তারতম্যের ব্যাপ্তিরেখা বিশ্লেষণ করলে আমরা সুন্দরের অন্য একটি বিশেষ দিকের পরিচয় লাভ করি। প্রকৃতকল্পে, অর্থ ও তাৎপর্যবোধের মানসিক ব্যুৎপত্তিগত ও বিস্তারের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, অব্যাহত ভাব-ভাবনাই সুন্দর ও অসুন্দরের ব্যাপ্তিরেখা নির্ধারণ করে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, দৃষ্টিভঙ্গি এবং

মনোভাব প্রচলিত সমাজ ও ঐতিহ্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আসলে কোনো শিল্পবস্তু সুন্দর, না অসুন্দর তার উপলব্ধিতে এ দুটি দিকই সমানভাবে কার্যকর। এদের একটির গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়ে অন্যটির গুরুত্বকে আমরা হ্রাস করতে পারি না। (Mothersill, 1984: 43)

আসলে নান্দনিক ভাবনা-চিন্তার ফলেই আমাদের মনোলোক শিল্পবস্তুর বস্তুগত বা বিষয়গত দিকে চালিত হয়। তবে শিল্পবস্তুর স্বরূপকে বিষয়গত দিকটি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। শিল্পবস্তুর স্বরূপকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে সৌন্দর্য সঞ্চারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন উপকরণ। আমরা যখন বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সৌন্দর্য, সুন্দর ও অসুন্দর নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করি তখন সৌন্দর্য বিষয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তা-ই সুন্দর ও অসুন্দরের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করে। সুন্দর বিষয় হিসেবে যাকে আমরা স্বীকৃতি দিই তা সামগ্রিক অর্থে এক এবং অভিন্ন হলেও আসলে তাতে অনেক কিছুর বৈচিত্র্যময় ঐক্য আমরা লক্ষ করি। আর তাতে সুন্দর ও অসুন্দর দুয়েরই স্থান সংরক্ষিত। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতাই আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার ধর্ম এবং অভিজ্ঞতা শিল্পবস্তুর বিষয়রূপকে আমাদের মানসনেত্রে প্রস্ফুটিত করে তোলে। অবশ্য আকাঙ্ক্ষাধর্মী অভিজ্ঞতার বিকাশ, প্রগতি এবং স্তর সবসময় এবং সর্বত্র এক ও অভিন্ন হয় না। এমনটি নন্দনতত্ত্ববিদেরা প্রত্যাশাও করেন না। কারণ নান্দনিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাজনিত অভিজ্ঞতার বিকাশ বিষয়মুখী হতে পারে। কিন্তু তারপরও তার প্রগতিতে নানাবিধ বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ বিন্যাসের সম্ভাবনাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় মনোলোক সবসময় থাকে অপ্রমত্ত স্বাধিকার মগ্ন। মনোলোকের এ স্বাধিকারকে কোনো বাধা-বিপত্তি প্রভাবিত করতে পারে না। নানা ধরনের বৈচিত্র্য এবং বিন্যাস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নান্দনিক অভিজ্ঞতায় আমাদের মনোলোক বিষয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিষয়ের ভাবনা-চিন্তায় মন স্বতঃতই সুস্থির ও অচঞ্চল থাকে। কোনো কিছুই তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে না। আবার কখনও কখনও মন বিষয়কে তার স্মৃতি ও কল্পনায় জাগ্রত করে অভীষ্টে পৌঁছার চেষ্টা করে, মন তার এই সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌম সক্রিয়তা এবং আকাঙ্ক্ষাধর্মিতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে শিল্পবস্তুর সমগ্রসন্ধিকে স্মৃতি, কল্পনা এবং প্রত্যক্ষবোধে বিশিষ্ট করে তোলে। বিশ্লেষণের ফলে অসুন্দর সমগ্রসন্ধি সুন্দর এবং সুন্দর সমগ্রসন্ধি অসুন্দর হিসেবে প্রতীত হতে পারে এবং প্রায় সময় হয়েও থাকে। এজন্য গূঢ় নিহিতার্থ সাধারণ কথাবার্তায় নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই বলে সুন্দর ও অসুন্দরের ব্যাপ্তিরেখাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। ভাববাদীরা যাই বলুন, অসুন্দর যেমন নানা স্তরভেদে

বিভাজিত, সুন্দরও তেমনি নানা স্তরভেদে বিভাজিত। তবে উভয়ের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে বলে উভয়কে একই মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করা যায় না। কান্ট-এর মতে, সুন্দরের যেমন কিছু অপরিহার্য লক্ষণধর্ম রয়েছে, অসুন্দরেও কতকগুলো শর্ত কাজ করে। সুন্দর ও অসুন্দর, উভয়ের লক্ষণধর্ম এক হবে না, এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাকে উপেক্ষা করে সুন্দর ও অসুন্দরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। (Kant, 1987: 148)

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, 'চোখের মতো চোখ নেই বলেই সুন্দর মূর্তিকেও কেউ অসুন্দর ভাবতে পারে'; 'যাকে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা' প্রভৃতি। দৈনন্দিন ব্যবহারে এ ধরনের বাক্য আমরা প্রায়ই প্রয়োগ করি। আমরা অভিরুচি, মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সুন্দর ও অসুন্দর সম্পৃক্ত এ ধরনের বক্তব্য ও অভিজ্ঞতাকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারি। তবে সুন্দর ও অসুন্দর সম্পৃক্ত এ ধরনের বক্তব্যের বেশির ভাগ ব্যাখ্যা করা গেলেও পুরো অভিজ্ঞতাকে কিন্তু অভিরুচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে অনেকটা করা যায়। কারণ অভিরুচি, মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি, এ ধরনের ধারণাগুলো মনের স্বাধীন সার্বভৌম সক্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। (Kant, 1987: 151) এগুলো শিল্পবস্তুর স্বরূপ দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত। এখানে কবুল করে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ যে, শিল্পবস্তুর স্বরূপ বস্তুর স্বরূপ থেকে খুব একটা বিসদৃশ হতে পারে না। শিল্পীর অভিরুচি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি শিল্পবস্তু বস্তুস্বরূপকে আবৃত, পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত করতে পারলেও নির্দিষ্ট দেশকাল ও সমাজ ঐতিহ্যের ব্যাপ্তিরেখায় তা অপরিবর্তিত হলেও সীমাবদ্ধ। যিনি আমাদের চোখে সুন্দরী নারী হিসেবে পরিচিত, যে সুর ও স্বর আমাদের কর্ণকুহরে মধুর রূপে ঝংকৃত, যে চিত্র ও চলচ্চিত্রকে আমরা ভালো বলে সাব্যস্ত করি, সেসব এবং এমনকি সমাজ প্রতিষ্ঠিত গুণীজনদের সুচিন্তিত মন্তব্যও অনেক ক্ষেত্রে সময় ও সমাজভেদে পরিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়। কাজেই সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণাও সমাজ ও কালভেদে পরিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়। এ সত্যটি অস্বীকার করা যায় না। (Aldrich, 1963: 112)

সাধারণ মন্তব্য

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে কখনও কখনও 'সুন্দর ও প্রয়োজন' এ দুটি স্বতন্ত্র ধারণার মধ্যে একটা অনাহূত তালগোল বেঁধে যায়। কখনও কখনও সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার বস্তু, রূপ, রস, অর্থ ও তাৎপর্য প্রভৃতি সবকিছুই সমগ্রসন্ধিতে একাকার হয়ে যায়। এ অবস্থাকে 'তালগোল' বলে অভিহিত করা একদিকে একে এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর, একে 'তালগোল' না-ভেবে এর স্বরূপ ও নিহিতার্থ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমরা জানি

সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ীভাবে সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। অংশত বিষয়ীগত এবং অংশত বিষয়গত কারণেই এ দুয়ের মধ্যে সীমারেখা আমরা টানতে পারি না। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সামাজিক বিষয়ও বস্তুগত আকার ধারণ করতে পারে। অবশ্য এই রূপপরিগ্রহণের সঙ্গে শিল্পী ও শিল্পরসিকের সার্বভৌম সক্রিয়তার কোনো বিরোধ স্বীকার্য নয়। আসলে বিরোধ বাঁধে সামাজিকতা এবং ঐতিহাসিকতায়। (Weitz, 1950: 144)

রূপ-বিগ্রহণের সঙ্গে শিল্পীমনের কোনো বিরোধিতা নেই। শিল্পকর্মে এই ব্যাপারটা একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। প্রধানত তিনভাবে আমরা শিল্পকর্মের এই সাধারণ নিয়মটিকে স্পষ্ট করে দেখতে পারি। **এক.** প্রথমেই রসবোধ, অভিরুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি যে প্রাথমিক স্তরেই স্থান-কাল ও পাত্রসাপেক্ষ তা আমরা দেখাতে পারি। কারণ এগুলো যে স্থান-কাল ও পাত্রভেদে সবসময়ই পরিবর্তিত হয় তা সহজেই অনুমেয়। **দুই.** রূপ, রীতি এবং বিন্যাসও সৌন্দর্যবিচারে নিতান্তই অপেক্ষিত। তবে এগুলো অবশ্যই দ্বিতীয় পর্যায়ের। স্মরণ রাখা ভালো যে, রূপে স্তরভেদ স্বীকৃত এবং সব ধরনের রূপকে মৌলিক বলেও দাবি করা যায় না। এই স্তরভেদের কারণে রীতি এবং বিন্যাস তাদের সাধারণ বা স্বীকৃত ধর্মের কারণে যেমন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, তেমনি ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে। অন্যদিকে রুচিবোধ ও রসবোধ মাঝে মধ্যে বিপ্লবতাড়িত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে রুচিবোধ ও রসবোধে আপেক্ষিকতার নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। (Weitz, 1950: 147)

তিন. তবে শিল্পবস্তুর অর্থ, তাৎপর্য এবং ব্যঞ্জনার দিকটি তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক বেশি স্থায়ী এবং সাধারণগ্রাহ্য। মহাকাব্য জাতীয় ধ্রুপদী সাহিত্য, চিত্রশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পবস্তুর আবেদন কালজয়ী। অর্থ, তাৎপর্য এবং ব্যঞ্জনার কারণেই এদের এই সার্থকতা। ইতিবৃত্ত-আশ্রিত মূল্যবোধের সংগ্রহকে বলে ঐতিহ্য। আর যা কালজয়ী তাকে বলা হয় শাশ্বত। আজ যাকে আমরা ধ্রুপদী বা চিরায়ত হিসেবে মান্যতা দিই তাকে নিত্যদিনের নয়, বরং বহুকালের সম্পদ বলে অভিহিত করা যায়। আর ইতিবৃত্ত-মাত্রই সামাজিক মানুষের ইতিবৃত্ত। মানুষ ও তার সমাজ-পরিবেশ নিয়েই ইতিবৃত্ত। এর বাইরে কোনো ইতিবৃত্ত থাকতে পারে না। সেজন্যেই অনেকে শিল্পবস্তুর সৌন্দর্যকে 'সামাজিক আরোপণ' বলে আখ্যাত করে থাকেন। এ ধরনের বক্তব্য অভিজ্ঞতাবাদীদের দ্বারা পরিবেশিত ও প্রচারিত। আজ-কাল অনেকেই এ ধরনের বক্তব্য সমর্থন করেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিল্পকর্ম যদি শাশ্বত বা চিরায়তই হয় তাহলে কেন এক যুগের শিল্পের মূল্য ও মর্যাদা অন্য এক যুগে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়? সুন্দর ও অসুন্দরকে যদি আরোপিত সত্তা হিসেবে মান্যতা দেয়া হয় তাহলে সেই সত্তার সর্বজনীন হওয়ার

প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, স্বাধীন রসিকজনের বিচারে সর্বজনস্বীকৃত সুন্দর ও অসুন্দর রূপে প্রতীত হতে পারে। এসব কারণে অনেকেই 'সামাজিক আরোপণ' তত্ত্ব অর্ধসত্য বহন করে বলে মনে করে থাকেন। (Gravin, 1948: 418)

দেখা যায়, 'সামাজিক আরোপণ' তত্ত্বে সুন্দর ও অসুন্দরের পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য ধরা পড়ে না। তবে এটি ছাড়া নন্দনতত্ত্বে এমন তত্ত্ব বা মতবাদও রয়েছে যেখানে সুন্দর ও অসুন্দরের পূর্ণসত্য আমরা লক্ষ করি। তবে সুন্দর ও অসুন্দর সম্পর্কিত পূর্ণসত্য তত্ত্বের যেসব বৈশিষ্ট্য শিল্পরসিক সুজনের ইচ্ছা, অনুভব ইত্যাদির সৃষ্টি নয়, সেগুলোর যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া একান্ত প্রয়োজন। শিল্পরসিকের সৃষ্টি নয় বলে সেসব বৈশিষ্ট্যকে আমরা গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। শিল্পসৃষ্টিতে অনুকরণ যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা অন্যত্র বিশদে আলোচনা করেছি। যাকে অনুকরণ করা হয় তাকে স্রেফ কল্পনা বা ইচ্ছাপ্রসূত বলেও বাতিল করে দেয়া যায় না। এমনকি শিল্পবস্তু সৃষ্টির অজুহাতে বস্তুজগতের মনোমুগ্ধকর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় আকার ও অন্যান্য অনুকরণকে খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার করা যায় না। সৌন্দর্য সৃষ্টির দাবির কাছে শিল্পীর ইচ্ছা এবং কল্পনাকেও আংশিকভাবে হলেও অনুগত থাকতে হয়। সৌন্দর্যের দায় কেবল অনুভবের নয়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপকরণের ওপরও এ দায় বর্তায়। এই বিশেষ অর্থেই সুন্দরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। আর সুন্দরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হলে নন্দনতত্ত্বের অঙ্গরাজ্যে অসুন্দরের স্থানও স্বমহিমায় স্বীকৃত। সেজন্য নন্দনতত্ত্বে সুন্দর ও অসুন্দর উভয় নিয়েই প্রণালিবদ্ধ আলোচনা করা হয়।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

Alexander Sesonke (1965) (ed.): *What is Art? Aesthetic Theory From Plato to Tolstoy*, Oxford: Oxford University Press.

Benedetto Croce (1959): *Aesthetics as Science of Expression and General Linguistic*, trans. D. Ainslie, London: Macmillan.

Bernard Bosanquet (1957): *A History of Aesthetics*, New York, Princeton University Press.

Dewitt Parker (1976): *The Analysis of Art*, New York: Yale University Press.

Edgar F. Caritt (1962): *The Theory of Beauty*, London: Methuen and Co.

Ernst IIans Gombrich (1971): *Illusion in Nature and Art*, London: Bloomsburg Publishing Co.

Erwin Panofsky (1968): *Idea: A Concept in Art Theory*, New York: University of South Caroline Press.

Etienne Gilson (2000): *Arts and the Beautiful*, London: Dalkey Archive Press.

Frank P. Chambers (1962): *The History of Taste*: Colombia, Colombia University Press.

G.W.F. Hegel (1975): *Hegel's Aesthetic: Lectures on Fine Arts*, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press.

George Dickie (1971): *Aesthetics: An Introduction*, Oxford and New York: Oxford University Press.

Guy Sircello (1975): *A New Theory of Beauty*, Princeton: Princeton University Press.

Harold Osborne (1968): *Aesthetics in the Modern World*, Oxford: Clarendon Press.

Herschell B. Chipp (1968): *Theories of Modern Art*, California: University of California Press.

Immanuel Kant (1987): *Critique of Judgement*, trans. J. Meredit, Oxford: Clarendon Press.

Jean-Paul Sartre (1967): *What is Literature?* Oxford: Clarendon Press.

Lucius Gravin (1948): 'The Problems of Beauty in Art', *Philosophical Review*, 1968, pp. 410-428.

Mary Mothersill (1984): *Beauty Restored*, Oxford: Oxford University Press.

Morris Weitz (1950): *Philosophy of the Arts*, Harvard: Harvard University Press.

Richard Wolheim (1968): *Art and the Objects: An Introduction to Aesthetics*, New York: Yale University Press.

Vergil C. Aldrich (1963): *Philosophy of Art*, London: Prentice-Hall

Walter T. Stace (1989): *The Meaning of Beauty*, Oxford: Oxford University Press.

Wtadystaw Tatarkiewcz (1974): *The History of Aesthetics*, The Hague: Muton.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪): *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।